দে ব সা হি ত্য কু টী র
২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন : কলিকাতা

দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত

পুনর্মুদ্রণ
পৌষ
১৩৬৬

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস, সি, মজুমদার কর্তৃক
মুদ্রিত

অমর প্রেম

*

* *

সুবাসপুর, গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে রেলে ঘণ্টাখানেকের পথ। গ্রাম হইতে ষ্টেশনে আসিতে মিনিট-কুড়িও লাগে না। আর, এ-গ্রামে ডেলি-প্যাসেঞ্জারেরই সংখ্যা বেশী। গ্রামখানি বেশী বড় না হইলেও গ্রামে একটি হাইস্কুল, একটি মেয়ে-পাঠশালা, একটি ছোটখাটো হাসপাতাল—এমন কি, একটি ছোট লাইব্রেরী পর্য্যন্ত আছে।

শরতের অপরাহ্ন। আকাশে খণ্ড-খণ্ড লঘু মেঘ যেন ছোট-ছোট নৌকার মত ভাসিতেছে। একটু পরেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিবে। রৌদ্রের উত্তাপটুকু দূরে গিয়া, শান্ত হিমে এখনি ধরণী শীতল হইবে।

সুহাসিনী বড় মেয়েকে ডাকিয়া বলিল—লতু, যা তো মা, খোকাকে আর যূথিকে নিয়ে একটু ওদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আয়! আমি ততক্ষণ খাবারটা ক'রে নিই।

লতুর ভালো নাম লতিকা, বয়স ষোলো বৎসর। বলিল—ওদের বাড়ী যাবো না।

মা রাগ করিয়া বলিল—যাবিনি তো সবাইকে নিয়ে আমি একলা কি ক'রে করবো। এখুনি সবাই হা-হা ক'রে এসে পড়লো ব'লে। তোদেরই তো পেটের জ্বালা ধরেছে।···সবাইকে কি গিল্‌তে দেবো, শুনি?

মেয়েও একটু রাগ করিয়া বলিল—তা ব'লে বুঝি আমি রোজ-রোজ ওদের বাড়ীতে প'ড়ে থাকবো! আমি পারবো না।

মা ঝঙ্কার দিয়া কহিল—কেন পারবে না, শুনি? কি নবাবের মেয়ে হয়েছো তুমি যে, এতটুকু তোমায় দিয়ে হবে না!

মেয়ে এবার সত্যই রাগিয়া গেল। বলিল—তুমি কেন আমার বাপ তুল্‌বে—আমি যাবো না।

মা বলিল—আ-মর, একে বাপ-তোলা বলে! তা যদি বলে তো বেশ করিছি তুলিছি। ভালো চাস্ তো শীগ্‌গির নিয়ে—ওঠ্।

মেয়ে তবু খুঁটির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। মা মেয়ের পিঠে খুব জোরে গোটাকয়েক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—যা রাক্কুসী, বেরো শীগ্‌গির আমার সুমুখ থেকে···যা, দূর হয়ে যা···

মেয়ে মার খাইয়া একটুও শব্দ করিল না। শুধু এক-বৎসরের খোকাটিকে কোলে লইয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। ছোট বোনটির বয়স চার বৎসর। সে মাতৃসন্নিধি এ-সময় নিরাপদ মনে না করিয়া ধীরে-ধীরে দিদির অনুসরণ করিল।

লতিকা কাহারও বাড়ী গেল না। বাহিরে আসিয়া প্রথমে সে চোখ দুইটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইল, তারপর বাহিরের রোয়াকে ভাইকে কোলে করিয়া বসিল। বোন যূথিকাও আসিয়া একটু ভয়ে-ভয়ে তাহার পাশে বসিল। লতিকা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল—কিছু বলিল না।

সেজ-মেয়ে কণিকা, মেয়ে-স্কুলে পড়ে। চারিটা বাজিবার একটু পরেই সে বই-শ্লেট লইয়া শুষ্কমুখে ফিরিল। তাহার বয়স এগারো বৎসর। ঘরে ঢুকিয়াই সে বই-শ্লেট কুলুঙ্গিতে ফেলিয়া বলিল—মা, বড্ড খিদে লেগেছে, কিছু হয়নি ?

বলিয়া ক্ষুধিত-দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল।

সুহাসিনী মেয়ের শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে আর বেশী রূঢ় কথা বলিতে পারিল না। তবুও রাগটুকু যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া বলিল—কি ক'রে হবে খাবার। নিজে তো

আর চারখানা হাত বের করতে পারিনি! লতিকে আমি কতক্ষণ থেকে বলছি—যা, ওদের নিয়ে একটু বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আয়, আমি ততক্ষণ খাবারটা ক'রে নিই। তা, মেয়ের বয়ে গেছে সে-কথা শুনতে। শেষে ঘা-কতক খেয়ে তবে ওদের বাড়ী গেল।

কথিকা বলিল—দিদি তো ওদের বাড়ী যায়নি···বাইরের রোয়াকে ব'সে রয়েছে যে! দাও, আমায় দাও, আমি রুটি বেলে দিচ্ছি।···রোসো, হাত-পা ধুয়ে আসি।

বলিয়া কথিকা চট্ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া রুটি বেলিতে বসিয়া গেল।

রুটি বেলিতে-বেলিতে কথিকা বলিল—দিদি ওদের বাড়ী যায়নি ভালোই হয়েছে। ওরা কেমনধারা লোক!

রুটি সেঁকিতে-সেঁকিতে সুহাসিনী বলিল—কেন, ওরা কি করলে?

কথিকা বলিল—পরশু, দিদি আর আমি খোকাকে নিয়ে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম, তা, বাঁড়ুয্যে-গিন্নি বলে কি জানো মা? বলে, এত-বড় মেয়ে, হাত-খালি কেন রে? তোর মা-বাপের কি দু'গাছা বাঁধানো শাঁখাও জোটে না যে, হাতে দিয়ে রাখে! দিদি তো শুনেই রেগে খোকাকে নিয়ে হুড়-হুড় করে চ'লে এলো। আমি আসবার সময় ব'লে এলাম—তাতে আর আপনাদের কি ক্ষতি হয়েছে? আপনাদের কাছে তো চাইতে যাচ্ছিনি!

সুহাসিনী এসব কথা কিছুই জানিত না। এ-পর্য্যন্ত শুনিয়া সে একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল—তারপর কি বললে গিন্নি?

কথিকা হাসিয়া বলিল—তা বেশ ভালোই বললে মা। বললে, বাবা! মেয়ে তো নয়, যেন কেউটে সাপ!

সুহাসিনী রাগের সঙ্গেই মুখে বলিল—তুই বেশ করেছিলি বলেছিলি! সঙ্গে-সঙ্গে তাহার চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। মনে হইল—হায়, কি অদৃষ্ট করিয়াই আসিয়াছিলাম যে, মেয়েদের হাতে দু'গাছা করিয়া কাঁচের চুড়িও দিতে পারেন না। লোককে ভগবান্ বলতে দিয়েছেন—বলবেই তো। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হইল—তাহা হইলে লতুর তো কোনো দোষ নাই! বিনাদোষে মেয়েটা মার খাইল! অথচ এমন মেয়ে—কেন ওদের বাড়ী যাইবে না সে-কথা তাহাকে বলিল না—চুপ করিয়া মার খাইয়া বাহিরে গেল।

সুহাসিনীর চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কথিকা রুটি বেলিতে-বেলিতে মায়ের দিকে চাহিল। রুটি বেলা বন্ধ করিয়া রাখিয়া—মায়ের কাছে সরিয়া ছল্-ছল্ চোখে মাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁদ্‌চো কেন মা? কি হয়েছে?

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া ভারি-গলায় বলিল—লতুকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো মা শীগ্‌গির! বল্, আমি ডাকছি।

কথিকা উঠিয়া গেল। একটু পরেই খোকাকে কোলে

লইয়া লতিকা, যূথিকার সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। লতিকা আসিয়া মায়ের কাছ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইল।

সুহাসিনী বলিল—লতু, সরে আয় তো মা, কাছে।

লতিকা সরিয়া আসিল।

সুহাসিনী বলিল—আমার কাছে বোস।

লতিকা বসিল।

সুহাসিনী লতিকার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—বড্ড লেগেছে মা! তা, আমাকে বলিস্‌নি কেন যে, বামুন-গিন্নি তোকে এ-কথা বলেচে? তোদের মেরে, কি গাল-মন্দ দিয়ে আমি কি সুখে থাকি মা!

লতিকা প্রায় বিনাপরাধে মায়ের কাছে মার খাইয়াও কাঁদে নাই, কিন্তু মায়ের মিষ্টি অনুতপ্ত বাক্যে সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুহাসিনী রান্না ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে লতিকাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

*

*   *

সুহাসিনীর শ্বশুরবাড়ী কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি দুর্গাপুর গ্রামে। সুহাসিনীর সঙ্গে যখন মনোহরের বিবাহ হয়, তখন মনোহর বি. এ. পড়ে। সেইবারই সে বি. এ. পাশ করিল। মনোহরের শ্বশুরবাড়ীর সকলেই—তাহার সঙ্গে সুহাসিনীও আশা করিয়াছিল যে, স্বামী বেশ একটা ভালো রকমের চাকরির যোগাড় করিবে। সুহাসিনী সব-সময়ই কল্পনা করিত, দূরদেশে পশ্চিমে বেশ ভালো জায়গায় স্বামী বড় চাকরি করিবে…সে ঘরের গৃহিণী হইয়া বসিবে…ঝি-চাকরে সংসারের মোটামুটি কাজ সব করিবে…সে শুধু সব গুছাইয়া রাখিবে…সংসারের সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিবে…স্বামীর জন্য জলখাবারটি করিবে…স্বামীর কারপেটের জুতার উপর ফুল তুলিয়া দিবে…সূচিশিল্পে দুই-চারিটি প্রবচন লিখিয়া ছবি তুলিয়া স্বামীর বসিবার ঘরে ও নিজেদের শোবার ঘরে টাঙাইয়া রাখিবে। কাহার হাতের এ-সব কেউ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামী বেশ একটু গর্ব্বিত-হাস্যের সহিত বলিবেন—আমার স্ত্রীর। মেয়েরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, কি জানি।… তারা আরো বলিবে, তোমারই হাতের বুঝি? বেশ হয়েছে! সে বলিবে—ভারি তো বেশ। আগে জানতাম, এখন সব প্রায় ভুলে গেছি…

বাপের বাড়ীতে সুহাসিনী শিল্প-কাজ, সেলাই, বাংলা লেখাপড়া মোটামুটি বেশ ভালোই শিখিয়াছিল। তাহার গলা বেশ মিষ্টি বলিয়া বাপ যত্ন করিয়া গান গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া দেখিল, সে-সব বড়-একটা কাজে আসিতেছে না। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা ইত্যাদি যে-সব কাজ সে যেমন-তেমন করিয়া শিখিয়াছিল, তাহারি দাম শ্বশুরবাড়ীতে বেশী হইল। ক্রমে ঘর-সংসারের কাজের মধ্যে শিল্প-কার্য্যাদি কোথায় ভাসিয়া গেল! একদিন লুকাইয়া গুন্‌গুন্‌ করাতে, শ্বশুরবাড়ীতে এমন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল, যাহার ফলে সে যে কখনো গান গাহিতে পারিত, সে-কথা সে নিজের কাছেও লুকাইয়া ফেলিল।

এমন সময় মনোহর বি. এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিল। সে দিনের বেলায় বাহিরে গল্পগুজব করিয়া বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী ঘুরিয়া, রাত্রেও দশটা অবধি খেলিয়া বাড়ী ফিরিত, আহারাদির পর রাত্রি এগারোটা-বারোটার পর কখনো-বা স্ত্রীকে লইয়া কাব্য করিবার চেষ্টা করিত। তবে, সমস্ত দিন খাটিবার পর বেশীদিনই সে ঘুমাইত। কখনো-বা কাব্যটুকু উপভোগ করিবার চেষ্টা করিত। মনোহর কখনো-বা অনুযোগ করিত —আজকাল সে পড়ে না কেন? তখন তাহার ঠোঁটের আগায় উত্তর আসিত—তোমাদের সংসারের বাসন মাজিতে, ঘর ধুইতেই যে আমার সব সময় কাটিয়া যায়, পড়িবার সময় আর

কোথায় পাইব ? কিন্তু তাহা না বলিয়া শুধু তাহার বড়-বড় চোখ মেলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিত, কখনো-বা অনিচ্ছায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত। মনোহর জিজ্ঞাসা করিত—রাগ করলে নাকি ?

সে মৃদুস্বরে বলিত—না।

একদিন সুহাসিনী বহুকাল-অপঠিত একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিয়াছিল, তাহার ফলে ভাত ধরিয়া গিয়াছিল এবং বড়-জা বলিয়াছিল, 'গরীবের ঘরে, মেমসাহেবের মত বই পড়লে চলবে না।' ইহার পর সুহাসিনী আর সে-চেষ্টা করে নাই!

সুহাসিনীর শ্বশুর তখন জীবিত। তিনি জমিদারী-সেরেস্তায় টাকা-কুড়ি বেতনে কাজ করিতেন। সুহাসিনীর ভাসুর মার্চেন্ট-আপিসে ষাট টাকা মাহিনা পাইত। তখন ভাসুরের মাত্র দুইটি ছেলে হইয়াছিল—সংসারও তেমন বড় ছিল না। বিপত্নীক শ্বশুর, ভাসুর, বড়-জা ও তাহার দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে। ভাসুরের টাকায় সংসার চলিত, শ্বশুরের টাকায় মনোহরের পড়া চলিত। একটা প্রাইভেট মেসে থাকিয়া সে পড়িত বলিয়া ইহাতে এক-রকমে চলিয়া যাইত। কখনো কিছু কম পড়িলে, দাদার কাছ হইতে মনোহর চাহিয়া লইত। সকলেরই আশা হইল, মনোহর বি. এ. পাশ করিয়া বড়-গোছের একটা কাজ পাইবে।

মনোহর পাশও করিল...কয়েকদিনের জন্য কিছু সম্ভ্রমও

বাড়িল, সুহাসিনী পর্য্যন্ত তাহার কিছু ভাগ পাইল, কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না।

চাকরি পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। কথায়—বি. এ. পাশ যুবকের ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেও বাধা নাই, কিন্তু কার্য্যকালে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের একটা ছোট কেরানীর পদও দুর্লভ। অনেক চেষ্টা করিয়াও সুবিধামত তাহার কোনো চাকরিই জুটিল না। সব্‌ডেপুটি, সব্‌রেজিষ্টার, সব্-ইন্‌স্পেক্টারের পদের জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই সে যোগাড় করিতে পারিল না। শেষে ডাকঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া জানিল, বর্ত্তমানে খালি নাই, খালি হইলে সংবাদ দেওয়া হইবে। সে-সংবাদ আর আসিল না।

মনোহরের দাদা একদিন আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহাদের আপিসে একটা তিরিশ টাকার চাকরি খালি আছে। গ্রাজুয়েটকে এ-পদ দিবার ইচ্ছা সাহেবের ছিল না, তবে অনেক চেষ্টায় সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করিয়াছি, কিন্তু কালই হাজির হইতে হইবে, নহিলে পাওয়া যাইবে না।

মনোহরের সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বি. এ. পাশ করিয়া এত আশা-ভরসার পর শেষে মাত্র তিরিশ টাকার একটা চাকরি !—তাও মার্চ্চেণ্ট-আপিসে ? আর, এমন মার্চ্চেণ্ট-আপিসে, যেখানে তাহার দাদা এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া ঢুকিয়া আজ ষাট টাকা মাহিনা পাইতেছে। সে খুব জোরের সহিত বলিল—আমি এ-কাজ কিছুতেই করিব না। তাহার দাদা

বলিল—বসিয়া থাকিলে যদি চলে, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত আহার পাওয়া যায়, লোকে কেন খাটিতে চাহিবে? কথাটা অনেকটা সাধারণভাবেই বলা হইয়াছিল, কিন্তু মনোহর কথাটা বিশেষভাবেই প্রযুক্ত বলিয়া মনে করিল। এই লইয়া দুই ভাইয়ের মধ্যে বেশ একটু মন-কষাকষি হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় মনোহরের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। ইহার কিছু পরেই মনোহরের পিতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদির মাস-কয়েক মধ্যে সহজেই প্রতীয়মান হইল যে, পিতার মৃত্যুতে সংসারের আয় কমিয়াছে এবং কন্যার জন্মগ্রহণে কিছু খরচ বাড়িয়াছে। তাছাড়া ভবিষ্যতে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে। বধূ হইয়া আসিয়া অবধি সুহাসিনীকে জায়ের সঙ্গে সমান করিয়া সংসারের কাজ করিতে হইত। আজকাল তাহার একটু বেশী কাজই পড়িল। স্বামীর বেকার অবস্থা ও শ্বশুরের মৃত্যুর ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল ভাবিয়া—মুখ বুজিয়া সুহাসিনী সে-সব কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তথাপি মাঝে-মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হইতে লাগিল।

এইভাবে দুই বৎসর কাটিয়া যাইবার পর কাঁচড়াপাড়ার স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ খালি হইল। তখনকার হেডমাষ্টারের ঐ স্কুলেই সে ছাত্র ছিল, তদুপরি সে স্থানীয় লোক বলিয়া তাহাকেই নিযুক্ত করা হইল। বেতন হইল কিন্তু মাসিক ত্রিশটি টাকা। তাহার দাদা বলিল—হতভাগাটা যদি আমাদের আপিসে সে-চাকরিটা লইত, তাহা হইলে

আজ পঞ্চাশ টাকা মাহিনা হইত। এখন তো সেই তিরিশ টাকা ভালো লাগিল! শুনিয়া মনোহর চুপ করিয়া রহিল।

মাস-দুয়েক সংসারে একটু শান্তি রহিল। এই সময়ে সুহাসিনী আর-একটি কন্যা প্রসব করিয়া গোলযোগ আবার বাড়াইল। সঙ্গে-সঙ্গে মনোহরের কিছু বেতন বাড়িলে বোধ-হয় গোলযোগ তত হইত না। কিন্তু তাহা না হওয়ায় গোলযোগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। শেষে দুই ভাইয়ে কথাবার্ত্তা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল—যদিও তাহার চতুর্গুণ কথাবার্ত্তা দুই ভ্রাতার স্ত্রীর মধ্যে আদান-প্রদান হইতে লাগিল। ক্রমশঃ শান্তিপ্রিয়া সুহাসিনী কলহ-নিপুণা হইয়া উঠিতে লাগিল। দেখিয়া-শুনিয়া মনোহর বড়ই ব্যথিত হইত। স্ত্রীকে কিছু অনুযোগ করিতে গেলে সে বলিত—তুমি মাহিনা কম পাও বলিয়া তো আমি গতর দিয়া পোষাইয়া দিতেছি··· ঝি-বামুনের কাজ একাই করিতেছি। তবুও যদি দিনরাত্রি বাক্যযন্ত্রণা সহিতে হয় তো মানুষ কত সহিতে পারে!

এক রাত্রে সুহাসিনী সাশ্রুনেত্রে বলিল—তুমি বিদেশে একটা পঁচিশ টাকার চাকরি যোগাড় করিয়া আমাকে লইয়া চলো, আমি মেয়েদের ভাতের মাড় খাওয়াইয়া, নিজে একবেলা খাইয়া থাকিব, সেও আমার ভালো···তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

এইসময়ে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে মনোহর সুবাসপুর হাইস্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ যোগাড় করিয়া লইল ও সপরিবারে সেখানে চলিয়া গেল। সে আজ বারো-তের

বৎসরের কথা। সুবাসপুরে আসিয়া এই কয়বৎসরে তাদের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। কথিকা বারো বৎসরের···ছেলে রামপ্রসাদের বয়স নয় বৎসর···ছোট মেয়ে যূথিকা ছয় বৎসরের···খোকা বৎসর খানেকের। যূথিকা ও খোকার মাঝে আর-একটি শিশু আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েকদিনের বেশী সে আর পৃথিবীতে থাকে নাই!

কিন্তু যে-সুখের আশ্বাসে সুহাসিনী বিদেশে আসিয়াছিল, সে-সুখ কি সে পাইয়াছিল?

রামপ্রসাদকে লইয়া বেলা ছয়টা আন্দাজ মনোহর বাসায় ফিরিল। রামপ্রসাদ সেই কখন বেলা দশটায় তাড়াতাড়ি দুটি ভাত খাইয়া গিয়াছিল—সমস্ত দিনটা আর কিছু খায় নাই··· ক্ষুধায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি জুতা-জামা খুলিয়া ফেলিয়া, বইখানি একটা কুলুঙ্গিতে রাখিয়া বলিল—মা, বড্ড খিদে পেয়েছে—শীগ্‌গির কিছু খেতে দাও না!

বলিয়া চট্ করিয়া হাতে-মুখে জল দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

মনোহর পাশের ঘরে যাইয়া একখানি পাখা লইয়া আস্তে-আস্তে বাতাস খাইতে লাগিল।

সুহাসিনী দু'খানা রুটি ও একটু তরকারী ছেলের সম্মুখে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ইস্কুলে কিছু খাবার খাসনি কেন? সেই কোন্ সকালে খেয়ে যাস্?

নয় বৎসরের ছেলে এক-টুকরা রুটি মুখে পূরিয়া বেশ

বিজ্ঞের মত বলিল—খিদে তো তেমন লাগে না! বাবা খেতে বলেন রোজ, আমি খাই না।

সুহাসিনী একটু বিরক্তির সহিত বলিল—ভারি কাজ করো, বাপের সাশ্রয় করো। খেলেই তো পয়সা খরচ হবে।

রামপ্রসাদ বলিল—বাবা তো আমাকে খেতে বলেন, মা!

সুহাসিনী বলিল—সে যা বলে তা বুঝতেই পাচ্ছি। তুই যেমন ছেলে তেমনি থাক্ দেখি! তোর আর ঢাক্‌তে হবে না।

মনোহর ভিতর হইতে একটু রুক্ষস্বরে বলিল—কেন লুকোতে যাবো বলো! এ তো আর খুন-জখম কিছু করা হয়নি যে, ঢাক্‌বার দরকার হবে।

সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ বলিল—তোমার যা কাজ, খুন-জখমের চেয়ে বেশী। এইটুকু ছেলে সেই দশটায় একমুটো খেয়ে গেছে, আর এখন সন্ধ্যে হতে চললো, এখনো পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়লো না।...তা, একে ছটা পর্য্যন্ত বেঁধে না রেখে, চারটের পর যেমন সবাই আসে তেমনি একেও ছেড়ে দিলে তো হয়।

মনোহর হাত হইতে পাখাখানি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—ছুটির পর ওকে তো আমার কোনো কাজের জন্যে আটকে রাখিনি! ছেলেরা ছুটির পর পড়ে, ও বলে, আমিও প'ড়ে তবে যাবো। তাই ওকে আর জোর ক'রে টেনে পাঠাইনি।

সুহাসিনী তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—আর অত লেখা-পড়ায়

কাজ নেই। তুমি লেখাপড়া শিখে যত করছো—তোমার ছেলেও তত করবে।

মনোহর বলিল—আমি সত্যি ক'রে লেখাপড়া শিখিনি তাই আমার মধ্যে শক্তি জন্মায়নি, কি উচিত কি অনুচিত সে জ্ঞানও হয়নি। নিজে কিছু না বুঝে পরের কথামত কাজ ক'রে এসেছি, তাই আজ ফল পাচ্ছি। ও যাতে প্রকৃত লেখাপড়া শিখতে পারে সেইজন্যে একটু চেষ্টা করছি, তোমার কথায় তো সে চেষ্টা ছাড়তে পারি না।

সুহাসিনী বলিল—আমার কথামত তুমি চিরদিন চ'লে এসেছো তাই আজ তোমায় চলতে বলবো। তা যদি চলতে, তাহ'লে তোমার এত দুর্দ্দশা হতো না, আমিও এমন ক'রে বয়ে যেতাম না, আর লোকের কাছে আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থাকতে হতো না। এত-বছর কাজ করছো—তুমি বি. এ. পাশ করেছো, মুখ্যুও নও—এত বড় মেয়ে তোমার ঘরে—তাদের দু'হাতে দু'গাছা বাঁধানো শাঁখা দেবারও তোমার ক্ষমতা নেই।

এতক্ষণে আসল কথাটা আসিয়া পড়িল।

তাতে কি হয়েছে ?—মনোহর ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল।

সুহাসিনী খুব উচ্চ-কণ্ঠে বলিল—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। লোকে যে ছি-ছি করে। পাশের বাড়ীর লোকেরা কত কথাই বলে। বলে, বাপ-মার এমন ক্ষমতা নেই যে, দু'হাতে দু'গাছা কিছু দেয়।

মনোহর বলিল—তা, মেয়েদের, ওদের বাড়ী যেতে দাও কেন ? না যেতে দিলে তো আর কথা শুনতে হয় না !

সুহাসিনী। তুমি তো বেশ বললে—যেতে দাও কেন ! দুধ তো নাও একসের, সে তো তোমার সকালের চা ক'রে খোকাকে দু'বার খাওয়াতেই শেষ হয়ে যায়। তারপর তোমার বার্লি দু'ঘণ্টা ধ'রে সেদ্ধ হবে—তবে তো গিল্‌তে দেবো ! ততক্ষণ যে কেবল রান্না-ঘরের দিকে দেখিয়ে দেবে আর কাঁদবে ! তবু পরের বাড়ী গিয়ে অন্য ছেলেপুলের সঙ্গে দু-দণ্ড স্থির হয়ে থাকে। ও-ও বাঁচে, আমিও বাঁচি।

মনোহর। তাহ'লে বার্লি একটু সময়মত ক'রে রাখলেই পারো। তুমি সময়মত করবে না, তাতেও আমার দোষ হবে ?

সুহাসিনী। না, আমারি দোষ। রান্না, বাসনমাজা, জলতোলা সবই প্রায় এক-হাতে করছি, তবুও আমার নিস্তার নেই। মেয়েটাকে দিয়ে যে একটু কাজ পাবো, তারও উপায় নেই। একজন স্কুলে প'ড়ে আমার মাথা কিন্‌ছে, আর-একজন তো খোকাকে নিয়ে আছে, একটু সময় পেলেই বই খুলে বসছে, তার ওপর তোমার আবার শাসন আছে···পড়া বলতে পারা চাই। তুমি লেখাপড়া শিখে সংসারের সব দুঃখ ঘোচালে—এখন তোমার মেয়েরা বাকি আছে।

মনোহর। তোমার কথাগুলো বড় কর্কশ হচ্ছে দিন-দিন। লেখাপড়ার কথা নিয়ে ঘা না দিয়ে তুমি কথা বলতে জানো না। এ তুচ্ছ লেখাপড়া জানে না অথচ অগাধ জমিদারী আছে

এমন দেখে যদি বিয়ে করতে, তুমিও বাঁচতে—আমিও বাঁচতাম। এখন আর তার জন্যে আপশোষ ক'রে কী হবে।

কথা বলিতে-বলিতে একটা গভীর দুঃখ তাহার মনোমধ্যে সঞ্চিত হইয়া উঠিল। বৈকাল চারিটা পর্য্যন্ত স্কুলে খাটিয়া, তারপর ছুটির পর কয়েকটি ছেলেকে স্কুলের ঘরে বসিয়া প্রাইভেট পড়াইয়া সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিল, আর তার স্ত্রী কিনা তুচ্ছ কথা লইয়া তাহাকে আঘাত দিয়া কথা কহিতে লাগিল······এই সংসার! এই সংসারের সুখ! ইহাই দাম্পত্য-প্রেম!

বসিয়া-বসিয়া এ বাদানুবাদ মনোহর আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া আল্‌না হইতে একটা কামিজ টানিয়া লইয়া গায়ে দিয়া, তালি-লাগানো জুতা-জোড়াটি পরিল। তারপর কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে শুনিতে পাইল, সুহাসিনী বলিতেছে—ডেকে বল্ না, খেতে হবে না? খাবার দেওয়া হয়েছে যে!

রামপ্রসাদ খাওয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বাবা! খাবার দেওয়া হয়েছে, খাবে এসো।

মনোহর ততক্ষণে বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে!

বার-বার তাহার লেখাপড়াকে লক্ষ্য করিয়া সুহাসিনীর তাচ্ছিল্যের কথা মনোহরকে কঠিনভাবে আঘাত করিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে আর তাহাকে স্থিরভাবে থাকিতে দিতেছিল না।

মনোহর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখেই যে-রাস্তা উত্তরদিকে দুই-তিনটা বড়-বড় আমবাগানের মধ্য দিয়া বরাবর সোজা নদীর ধারে গিয়াছে, মনোহর সেই পথ ধরিল। তাহার যেন কিছুক্ষণের জন্য ভাবনা-চিন্তা লোপ পাইয়াছিল। লোকে যেমন সময়ে-সময়ে কোনো জিনিসের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে, আর-কোনো দিকে তাহার দৃষ্টি থাকে না, চিন্তা থাকে না, মনোহরের চিত্তে তখন সেইরূপ কেবল একটি কথা জাগিতেছিল, তাহা সুহাসিনীর কঠিন তাচ্ছিল্য। তাহার সমগ্র হৃদয় যেন বড়-বড় চক্ষু মেলিয়া তাহার প্রতি তাহার অধীত-বিদ্যার উপর স্ত্রীর বিপুল তাচ্ছিল্যের দিকে চাহিয়াছিল। মনোহর অর্দ্ধেক পথ আসিতেই সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। তখন একটি ছাত্র বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। এইসময়ে শিক্ষককে নদীর ধারে যাইতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—স্যার, এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

প্রথমবার মনোহর শুনিতেই পাইল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতে, মনোহর চমকিয়া তাহার পানে চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলছো ?

ছাত্রকে তৃতীয়বার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তখন মনোহর বলিল—এই একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

ছাত্রটি একটু বিস্মিতভাবে শিক্ষকের পানে চাহিয়া রহিল। কিছু বলিল না।

ক্রোশ-খানেক দূরেই গঙ্গা। মনোহর ধীরে-ধীরে গঙ্গার ধারে গিয়া পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে।

মনোহর গঙ্গাতীরে বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

সংসারে এতগুলি পরিবার, কিন্তু আয় মাত্র পঞ্চাশ টাকা। চল্লিশ টাকা স্কুলে আর দশ টাকা স্কুলের ছুটির পর কয়েকটি ছেলে প্রাইভেট পড়াইয়া। সে দশ টাকা, বাড়ী-ভাড়াতে চলিয়া যায়, বাকি চল্লিশ টাকাতেই সব করিতে হয়। যে-মাসে ডাক্তার ও ঔষধের খরচ পনেরো-কুড়ি টাকা পড়িয়া যায়, সে-মাসে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হয়। তারপর সেই ধার শুধিতে কয়েক মাস কাটে। ধার শোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা পেটের উপর বাণিজ্য করিয়া। সে কয়মাস…সত্য কথা বলিতে কি…ছেলেমেয়েদের জলখাবার জোটে না। কি লজ্জার কথা!

কিন্তু সে তো বসিয়া থাকে না! সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমান খাটে…রাত্রিটা কেবল ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য রাখে। আর, তাহাও তো দরকার। কিন্তু এত করিয়াও তো কিছু হইল না! না রহিল সুখ, না রহিল শান্তি। প্রেম-ভালোবাসা কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো-বা বড়-লোকের ঘরে থাকিতে পারে। কিন্তু দরিদ্রের ঘরে তাহা দুর্লভ। গাছপালার জীবনের পক্ষে যেমন সূর্য্যের আলোক ও জলের ধারার প্রয়োজন, প্রেমের মূলেও তেমনি কাঞ্চনের পরশ

চাই—না-হইলে গাছপালার মত প্রেম শুকাইয়া যায়। নহিলে সেই সুহাসিনী এত গর্ব্বিত হইল কি করিয়া? সে কিনা, ছেলেমেয়েদের সাম্‌নে বলিয়া বসিল—'লেখাপড়া শিখে তুমিও যত করছো, তোমার ছেলেও তত করবে।' আমি সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া অবসন্ন দেহে যে ঘরে ফিরিলাম—সে-কথা তাহার মনেও হইল না!

আজ যদি সে আর বাড়ী না ফিরিয়া দূর—দূর—অতি দূর দেশে চলিয়া যাইতে পারিত···তারপর বহুবৎসর পরে প্রচুর টাকা লইয়া ফিরিতে পারিত, তাহা হইলে ইহার উপযুক্ত উত্তর হইত। কিন্তু সে উপায় যে নাই। নিশ্চিত অনাহারের মুখে উহাদের ফেলিয়া দিয়া কি করিয়া সে এখন কোথায় যায়! তাহা হইলে কাল যে তাহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়···তারপর অনাহারে মৃত্যু···কি ভীষণ অবস্থা! লতিকার বয়স পনেরো বছর হইয়া গিয়াছে—তাহারই-বা বিবাহ কি করিয়া হইবে।

মনোহর বসিয়া-বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, বাড়ী ফিরিতেই হইবে। কিন্তু উপার্জ্জনও তো দরকার। যদি কিছু অর্থ রোজগার করিতে পারে, তবে সেই অর্থের ভিতর দিয়া সে স্ত্রীর উপর এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ লইতে পারিবে।

গাঢ় অন্ধকারে নদীর দুইধার ছাইয়া গেল। এ-পারের তীরের ঝিল্লি ডাকিয়া-ডাকিয়া যেন শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল।

অন্ধকার আকাশের উজ্জ্বল তারকাগুলি কালো আঁখিতারার মত জাগিয়া রহিল।

এদিকে গৃহকোণে সুহাসিনী হাতে কাজ করিতেছিল আর মনে-মনে ভাবিতেছিল, চিরকালই তাহার কষ্টে গেল। যতদিন বৌ হইয়া শ্বশুরবাড়ীতে ছিল, ততদিন রাঁধুনি ও ঝিয়ের মত দিবারাত্রি খাটিতে হইয়াছে, এখানে স্বাধীনভাবে থাকিয়াই-বা দুঃখ ঘুচিল কই ? নুন আনিতে পান্ত ফুরায়—এ কোনোদিনই ঘুচিল না। কথায়-কথায় মুখে লাগিয়াই আছে, 'আমি কি আর ব'সে আছি, আমি কি দিন-রাত্রি খাটছি না ?'

আর, সেই-বা কি ব'সে আছে ! সমস্ত দিন-রাত্রি···আলো নেই—বাতাস নেই—সব-সময়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ, আর ছেলে-পুলের সঙ্গে বকিতে-বকিতে প্রাণ অন্ত। কি-সুখেই তাহাকে রাখিয়াছে ! তার উপর, একটা কথা মুখের উপর আনিলেই রাগ। তাহাকে যেন দাসী-বাঁদী রাখিয়াছে যে, মুখ বুজিয়া চিরটা-কাল খাটিয়া যাইতে হইবে। একটা-কিছু বলিলেই সর্ব্বনাশ ! না খাইয়া রাগ দেখানো হইল। তা দেখাক্—সেও রাগ করিতে জানে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাগের ঝোঁকে এক-আধটা কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল। চোখ দিয়া দুই-চারি ফোঁটা জলও আসিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু রাগের বশে চোখের জলকে সে আমলই দিতেছিল না।

রাত্রি আটটা হইয়া গেল, তখনও মনোহর ফিরিল না। লতিকা বলিল—মা, বাবা তো এখনও এলেন না !

সুহাসিনী ঝাঁঝের সহিত বলিল—না এলো তো আমি কি কববো? আমি তো এখন কোমরে কাপড় বেঁধে তার খোঁজে যেতে পারি না!

মুখে এই কথা বলিলেও মনে-মনে সুহাসিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল। লতিকা জিজ্ঞাসা করিল—রামুকে নিয়ে আমি একবার খুঁজতে যাবো?

সুহাসিনী বলিল—কোথায় যাবি? খুঁজতে যাবার কি একটা-চুলো আছে!

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল।

সুহাসিনী ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—কিসে ছেলেমেয়ে পরিবার সুখে-শান্তিতে থাকবে সে-চেষ্টা নেই, থাকবার মধ্যে আছে পুরুষের লক্ষণ—রাগ। আমায় যেমন বিনাদোষে কষ্ট দিচ্ছে, এ-কষ্ট তোলা থাকবে।

সঙ্গে-সঙ্গে চোখের জলটা মুছিয়া ফেলিল।

এমন সময় মনোহর ধীরে-ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। চোখের জলটা সে দেখিতে পায় নাই, কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল। মনে-মনে সে যে সংকল্প করিয়া আসিয়াছিল, ইহাতে সে সংকল্প দৃঢ়তর হইল। তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর খুলিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

---

*

* *

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়াই মনোহর বাহির হইল। লতিকা চায়ের জল চড়াইয়াছিল। পিতাকে এত সকালে বাহির হইতে দেখিয়া লতিকা বলিল—বাবা, চা খেয়ে যাও, এখুনি হয়ে যাবে।

মনোহর বলিল—আজ আর আমি চা খাবো না মা! শরীরটা ভালো নেই। তোমরা খেয়ো।

বাবা চলিয়া গেলে, লতিকা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চায়ের কেট্‌লি নামাইয়া রাখিল। বাপের অসুখ যে শরীরে নয়, মনে, তাহা লতিকা বুঝিয়াছিল।

সুহাসিনী কাপড় কাচিয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে, লতিকা বলিল—মা, বাবা আজ চা খান্‌নি।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

লতিকা। বললেন, শরীর ভালো নেই, খাবেন না। কিন্তু আমার মনে হলো, বাবা রাগ করেছেন।

সুহাসিনী। কিসে তোর সে-কথা মনে হলো?

লতিকা। তুমি কাল বলেছিলে—মোটে তো একসের দুধ—তার সিকি যায় চা করতে।

সুহাসিনী। তা, সে-কথা কি মিথ্যে?

লতিকা। মিছে, তা বলছিনি মা। কিন্তু বাবার সেইজন্যে মনে দুঃখ হয়েছে—তাই বলছিলাম।

সুহাসিনী। দুঃখ হ'তে তো আর পয়সা খরচ হয় না—তা দুঃখ হবে না কেন?

লতিকা আর কিছু বলিল না। চুপ করিয়া রহিল।

মনোহর বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, উপার্জ্জনের পথ দেখিতে। কিন্তু কি করিয়া যে দেখিবে, তাহা সে এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই। দুই-একটা ছেলে পাইলে সকালের দিকে সে পড়ায়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ছেলে-জোটানোই শক্ত।

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়দের বাড়ীর সম্মুখে আসিবামাত্র একটি যুবক হাস্যমুখে আসিয়া পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আসুন স্যার, একটু বস্‌বেন।

যুবককে দেখিয়া মনোহর একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—অমর যে! কবে এলে?

অমর বলিল—কাল রাত্রে এসেছি স্যার।

মনোহর। আর কে এসেছেন?

অমর। সবাই এসেছি। বাবা তিনমাস ছুটি নিয়েছেন, ঠিক করেছেন, ছুটিতে এখানেই থাকবেন। যদি সবার শরীর ভালো থাকে, এখান থেকেই ছুটির পর যাতায়াত করবেন।

মনোহর। তুমি কি করবে?

অমর। আমাদের কলেজ তো এখন মাস-দুই বন্ধ। যদি সুবিধা হয়, এখান থেকে যাতায়াত করবো—নইলে আমি একা কলকাতায় যাবো।

মনোহর। হোষ্টেলে থাকবে ?

অমর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন, বসবেন একটু।

অমরের পিছনে-পিছনে মনোহর ভিতরে আসিয়া বৈঠকখানায় বসিল।

মনোহর জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাবা এখনও ওঠেননি বোধহয় ?

অমর। আজ্ঞে না, তাঁর আজকাল উঠতে একটু দেরী হয়। আজকাল আটটার আগে বড়-একটা উঠতে পারেন না।

মনোহর। তাহ'লে আর-একদিন এসে ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো।

অমর। রাণু, লতু, সব ভালো আছে।

মনোহর। আছে বেঁচে! আমার মত গরীব বাপের পক্ষে তাদের যতদূর ভালো রাখা সম্ভব ততদূরই আছে।

অমর। মাইনে সেই চল্লিশই পাচ্ছেন···আর বাড়েনি ?

মনোহর। না। বাড়বার আশা খুবই কম।

অমর। আর কোথাও পড়ান না ?

মনোহর। পাঁচটি ছেলেকে পড়াই একসঙ্গে। দু'টাকা ক'রে দেয়। ওই দশটি টাকা—বাড়ী-ভাড়াতেই যায়।

অমর। স্যার, সেকেণ্ড ক্লাসে আপনার কাছে ইংরেজি আর ফার্ষ্ট ক্লাসে History প'ড়ে গেছি। তা এখনও তেমনি মনে আছে···চিরকালই মনে থাকবে। বিশেষ আপনার Poetry আর History পড়ানো জীবনে ভুলবো না। এখনও

এক-একবার মনে হয়, আবার এসে আপনার ক্লাসে ব'সে আপনার পড়া শুনি। খুব কম কলেজে আপনার মত Historyর Professor আছেন। অথচ আপনি এই পাড়াগাঁয়ের স্কুলে চল্লিশ টাকায় প'ড়ে আছেন!

মনোহর। কি করবো বাবা—অদৃষ্ট।

অমর। আচ্ছা স্যার! আপনি Historyর note লিখুন-না কেন! নাহয় আপনি যে-রকম ক'রে পড়ান, ঠিক সেই ভাবে একখানা Historyর Text-book লিখুন। তাতে জিনিস থাকবে সাধারণ বইয়ের চেয়ে বেশী। কিন্তু ভাষা ঠিক পড়ানোর ভাষা হওয়া চাই। নিশ্চয়ই তাতে আপনার দুঃখ ঘুচবে।

মনোহর। তুমি যখন বলছো—ভেবে দেখি। কিন্তু অমর, সংসারের চাপে একেবারে উৎসাহহীন হয়ে পড়েছি। চারিদিক অন্ধকার—কোনো দিক হ'তে একটা আলোর রেখা পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না।

অমর। আপনি এই করুন স্যার—আপনার কাছে আলোকের প্লাবন এসে পৌঁছুবে। আপনার লেখা বই নিশ্চয়ই অতি সুন্দর হবে—বাজারের কোনো বই তার সঙ্গে তুলনায় পারবে না।

মনোহর। আচ্ছা অমর, আজ থেকে আমি সেই চেষ্টা করবো। আজ তাহ'লে এখন উঠি।

অমর। একটু চা খেয়ে যান স্যার—এখুনি নিয়ে আসছি।

মনোহর। না অমর—থাক্, আর চা খাবো না।

অমর। কেন স্যার?

মনোহর। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই অমর। যখন আয় বাড়াতে পারিনি তখন ব্যয় কমানো উচিত। আজ লতু সকালে চা করছিল, আসবার সময়ে বললে—'বাবা, চা খেয়ে যাও।' বললাম—'না মা, চা আর খাবো না।' মা'র মুখখানি ম্লান হয়ে গেল। তারপরে আর তো কোথাও চা খাওয়া যায় না অমর!

তারপর উঠিয়া আবার বলিল—এখন যাই তা'হ'লে, তুমি একদিন যেয়ো।

অমরও সঙ্গে-সঙ্গে উঠিল। বলিল—হ্যাঁ স্যার! নিশ্চয়-ই যাবো—আজই যাবো'খন।

বলিয়া মনোহরকে রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল।

*

*   *

সেখান হইতে বাহির হইয়া মনোহর বাজারের দিকে গেল। তখন বেলা প্রায় আটটা বাজিয়াছে। চারিদিকে রৌদ্র ভরিয়া উঠিয়াছে।

বাজারে তখন কাপড়, চাউল ও মুদিখানা ইত্যাদির দোকান খুলিয়া গিয়াছে। কোনো-কোনো দোকান সবেমাত্র খুলিয়া ধূনা-গঙ্গাজল দিতেছে।

নরহরি দাসের চাউল ও মুদিখানার দোকান বাজারের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দোকানে থাকে নরহরি নিজে, আর তাহার তিন ছেলে। তাছাড়া দু'জন গোমস্তা। নরহরি এতই সাবধানী আর এমনই সতর্ক তাহার ব্যবস্থা যে, সকল সময়ে অন্ততঃ দুটি ছেলে দোকানে উপস্থিত থাকিবে। ভৃত্যের হাতে এক মিনিটের জন্য দোকান ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। হয় নরহরি নিজে; নাহয় দুটি ছেলে সর্ব্বদা দোকানে থাকা চাই-ই। তাছাড়া গোমস্তা আর একটি ছেলের হাতে দোকান ছাড়িয়া না দেওয়ার উদ্দেশ্য—একজন থাকিলে কাঁচা পয়সা পাইয়া পাছে কিছু সরাইয়া ফেলে। দু'জন থাকিলে যোগ করিয়া এ-কার্য্য চালানো কিছু কঠিন হইয়া পড়ে।

নরহরি কিছু ব্যয়কুণ্ঠ, মুখমিষ্টি ও সাবধান-প্রকৃতির লোক। দোকান তাহার মান, দোকান তাহার প্রাণ, দোকানই তাহার

সব। লোককে আদর-অভ্যর্থনা করা, সম্মান করা, এ-সব নরহরির চিরদিনকার অভ্যাস।

মনোহরকে সকালে তাহার দোকানের সম্মুখে দেখিয়া, নরহরি হাত তুলিয়া বলিল—প্রণাম মাষ্টারমশাই! আসুন, বসুন। বলিয়া বসিবার জন্য দোকানের ভিতর থলে-বিছানো একটা টুল দেখাইয়া দিল।

মনোহর বসিতে, নরহরি আবার বলিল—এত সকালে বাজারে যে!

মনোহর বলিল—আপনার কাছেই একটু কাজ ছিল, তাই এসেছি।

নরহরি। আমার কাছে? কি দরকার, বলুন!

মনোহর। আপনি একদিন বলেছিলেন, আপনার একজন খাতা-লেখার লোক দরকার···পেয়েছেন?

নরহরি। না, এখনো পাইনি—আমি নিজেই চালিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না, অসুবিধা হচ্ছে। লোক পেয়েছেন নাকি?

মনোহর। লোক ঠিক পাইনি, তবে আমি আপনার খাতা লিখে দিতে রাজী আছি।

নরহরি। আপনি লিখবেন? এতে সামান্য পাওনা। আপনার মত পণ্ডিত লোককে দিয়ে এ-রকম সামান্য কাজ করানো···

মনোহর। পাণ্ডিত্যের কথা আর বলবেন না দাসমশাই,

যে লোকের পরিবারবর্গের দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ভালোভাবে দিতে ক্ষমতায় কুলোয় না—তাকে আর পণ্ডিত বলা সাজে না। আর, আমি লিখছি ব'লে আমাকে ন্যায্যের বেশী দিতে হবে না। আপনি অন্য লোক রাখলে যা দিতেন তাই দেবেন। তবে আমি দিনমানে লিখতে পারবো না। সন্ধ্যের পর এসে যতক্ষণ বলেন লিখে দেবো। তাতে আপনার আপত্তি নেই তো?

নরহরি। না, তাতে আর আপত্তি কি হ'তে পারে! বেশ, আপনি তাই লিখবেন! তা, কত ক'রে দিতে হবে একটা ঠিক ক'রে ফেলুন!

মনোহর। সে আপনার যা ইচ্ছে তাই দেবেন।

নরহরি। সে তো ঠিক হলো না—একটা পাকা কথা কওয়া দরকার।

মনোহর। আমি জানি না—এতে কি-রকম আপনারা দেন। আমি চাই সৎপথে থেকে আরও কিছু উপায় করতে। কারণ, মাষ্টারিতে যা উপায় করি তাতে আমার ভালো চলে না। আমি আপনার খাতা লিখে দেবো, আরও দু'এক দোকানে যদি আপনার দয়ায় খাতা-লেখা পাই—তা'হলে আমার এক-রকম চ'লে যাবে।

নরহরি হিসাব করিয়া দেখিল, মাসে পাঁচ টাকার কমে আজকাল কোনো লোকই লিখিতে রাজী হয় না। এরকম ইংরেজি-জানা লোক একজন যদি হাতে থাকে, অনেক উপকারে

আসিতে পারে। তাহার উপর মনোহরবাবু লোক খুব ভালো, জানা আছে। কিন্তু খুব হিসাবী ব্যবসাদার হইলেও একজন পণ্ডিত লোককে মাসে পাঁচ টাকা দিব বলিতে তাহার মুখে বাধিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বলিল—আপনি সম্বৎসরের খাতা ঠিক ক'রে দেবেন, আমি পঁচাত্তর টাকা আপনার খোকাকে জল খেতে দেবো। অবশ্য, দু'চারখানা চিঠিপত্র ইংরেজিতে লিখতে হয়, তাও আপনাকে দয়া ক'রে লিখে দিতে হবে। তবে এ-টাকা আপনার যখন ইচ্ছে নিতে পারেন, তিন কিস্তিতেও নিতে পারেন।

মনোহর। আমি তো আপনাকে বলেছি, আপনি যা বলবেন তাতেই আমি রাজী হবো! আপনি পঞ্চাশ টাকা বললেও আমি রাজী হতাম। আমি এতেই রাজী এবং চিঠিপত্র বাংলা হোক, ইংরেজি হোক, আপনার যা দরকার হবে আমি তাই লিখে দেবো। আপনি দয়া ক'রে একটু চেষ্টা করবেন যাতে আরও দু'একটা দোকানে খাতা-লেখা পাই।

নরহরি। আচ্ছা, আমি সে-চেষ্টা করবো। নবীন আমার জ্যেঠতুতো ভাই হয়। তার দোকানে বোধহয় খাতা-লেখার লোকের দরকার। কিন্তু আমার আশ্চর্য্য মনে হয় মাষ্টারমশাই, এত লেখাপড়া শিখেও আপনাদের এ অর্থকষ্ট হয় কেন! আমরা মুখ্যু-মানুষ—ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে যদি দু'পয়সা ঘরে আনতে পারি, লেখাপড়া শিখে আপনার তার চেয়ে তো বেশী পারা উচিত।

মনোহর। আপনার উক্তির মূল কথাটা ঠিক। বুদ্ধি থাকলে আর বেশী লেখাপড়া শিখলে, উপার্জ্জনের শক্তি বেশী হওয়া উচিত, তাতে সন্দেহ নেই—হয়ও তাই। কিন্তু আপনি মূর্খ এবং আমি বিদ্বান্ এ ভুল কথা। কারণ, ব্যবসার যে বিদ্যা সে আপনিই আয়ত্ত করেছেন, আর আমি তাতে একেবারে অজ্ঞ। সাধারণ সংসারের অভিজ্ঞতার দাম, পড়া-বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী—তাতে আমি আপনার কাছে দাঁড়াতেও পারি না। ব্যবসার যে হিসাবপত্র আমি কাগজে-কলমে করবো, আপনি তা মুখে-মুখে ক'রে ফেলবেন। তফাৎ শুধু আমি ইংরেজিতে কিছু-কিছু লিখতে বা কথা বলতে পারি, আপনি তা পারেন না।

নরহরি। আপনি নিজেকে ছোট ক'রে আর আমাকে বাড়িয়ে অনেক কথা বললেন। কিন্তু আপনিও কি ইচ্ছে করলে ব্যবসা করতে পারেন না? না, ব্যবসা করলে আপনারই ব্যবসাতে বুদ্ধি খেলে না? নিশ্চয়ই খেলে।

মনোহর। তা খেলতে পারে, তবে অনেক পরে। সব-কাজেই শিক্ষা দরকার। ব্যবসার মত বড় জিনিষ শিক্ষা না হ'লে হবে কি-ক'রে! আমি যদি ব্যবসায় হাতে-কলমে শিক্ষা না পেয়ে ব্যবসা করি, আমাকে লোকসান খেতে হবে। লোকসান খেয়ে-খেয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হ'লে তবে যদি সমান হ'তে পারি। তারপর টাকার দরকার। টাকা না হ'লে কিছুই কিছু নয়।

নরহরি। টাকার দরকার ঠিকই মাষ্টারমশাই। কিন্তু ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকলে, টাকা করতে বেশী দিন লাগে না। আমি আমার মামার কাছে একটা টাকা নিয়ে ব্যবসা সুরু করেছিলাম। সেই টাকাতে চিনি, মিছরি আর দু'চার রকমের মশলা নিয়ে এখান থেকে দু'দিন ক্রোশ দূরের পাড়াগাঁয়ে যেতাম। দাঁড়িপাল্লা ছিল না, একপয়সার ক'রে মশলার পুরিয়া রাত্রে বেঁধে রাখতাম। মনে আছে, দু'আনার মরিচ কিনে-ছিলাম, সেই মরিচ যোলো পুরিয়া করেছিলাম; এক-এক পুরিয়া এক-এক পয়সা। চিনির জন্যে একটা ছোট বাটি রেখে-ছিলাম—এক পাত্র এক পয়সা। সে'ও রাতে পুরিয়া ক'রে রাখতাম। পাড়াগাঁয়ে দুয়োরের সামনে পেয়ে সবাই প্রায় দু'এক পয়সা ক'রে জিনিস কিনলে! প্রথম দিনেই আমার এক টাকার জিনিস দু'টাকায় বিক্রি হলো। সে-সব গ্রামে তরীতরকারি সস্তায় বিক্রি হতো…আলু-পটল নয় অবিশ্যি… লাউ-কুমড়ো এইসব। আনা-আষ্টেকের তাই কিনে আনতাম …এ-গ্রামে তাই অন্ততঃ দেড়া-দামে বিক্রি করতাম। এইরকম ক'রে খাওয়া-খরচ বাদে মাস-কয়েকের মধ্যে আমার হাতে একশো টাকা হলো। তখন পাড়াতে ছোট একখানা মুদিখানার দোকান দিই আর বাড়ীতে যেটুকু জমি ছিল তাতে লাউ-কুমড়ো-বেগুন এইসব লাগাতাম। দোকানে তাও রাখতাম, বাজারের চেয়ে সস্তায় না হলেও, অন্ততঃ সমান দরে দিতাম। পাড়ার মেয়েরা—যাঁদের বাড়ীতে পুরুষ নেই, তাঁরা আমার

দোকান থেকে নিতেন। তারপর দোকানের মাল ছাড়া হাতে যখন শ-পাঁচেক টাকা জমে, তখন ওই মতি কুণ্ডুর দোকানের কাছা-কাছি মুদিখানার দোকান দিই। তারপর কিছু-কিছু চালও সঙ্গে রাখি। তারপর ক্রমে-ক্রমে আপনাদের আশীর্ব্বাদে যা-কিছু হয়েছে।

মনোহর। এত কষ্ট করেছেন, তাই-না ব্যবসায়ে সফল হয়েছেন! এত কষ্ট করার ক্ষমতা বা সাহস কি আমাদের আছে? আপনি মাথায় জিনিস নিয়ে ফিরি ক'রে বিক্রি করেছেন, আর তা করতে আপনার লজ্জা হয়নি—আর এখন লক্ষপতি হয়ে তা বলতেও আপনার লজ্জা নেই। আর আমরা চেয়ারে ব'সে কাজ করি ব'লে জীবন ধন্য মনে করি। সমস্ত মাস খেটে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আনতে লজ্জা পাই না। আবার সেই সামান্য টাকা থেকে গড়ে অন্ততঃ টাকা-পাঁচেক জামা-কাপড়ে চ'লে যায়! আমার যা অবস্থা, তাতে বাজারে এসে নিজের হাতে বাড়ীর তরকারি বিক্রি করা উচিত। তা' তরকারি বিক্রি করবো কি—একটা লাউ-কুমড়ো গাছ বাড়ীতে পুঁতে যে নিজেদের বাজার-খরচ কমাবো, তাও হয় না আমাদের দ্বারা। আপনার কথার গুণে আজ আমার অনেক শিক্ষা হলো দাসমশাই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। দেখি আপনার আদর্শ নিয়ে এই অবেলায় কিছু করতে পারি কিনা। এখন তাহ'লে উঠি। আমি আজ সন্ধ্যে থেকেই আসবো। প্রথম দিন আপনি আমাকে শুধু এইটুকু বুঝিয়ে

দেবেন যে, কি-ক'রে আপনারা হিসাবপত্র রাখেন। কিংবা আপনার আগেকার খাতাপত্র দেখালেও আমি ঠিক ক'রে নেবো।

নরহরি। সেজন্য আপনি ভাববেন না, আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে দেবো। তাছাড়া, আমার লেখা খাতাপত্র আছে, তাও দেখবেন। আমিও তো আগে খাতাপত্র লিখতাম। ইদানীং চোখে একটু কম দেখছি ব'লে ছেড়ে দিইছি।

মনোহর তখন উঠিয়া ধীরে-ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরিল। অবস্থা পরিবর্ত্তন করিবার অনেক উপায়ের কল্পনা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল।

*

*　　*

অমরের পিতা চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডিরেক্‌টার-জেনারেল অব্‌ পোস্ট-আপিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। মোটা মাহিনা পান। পূর্ব্বে গ্রাম হইতেই ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিতেন, সাহেবি পদ হইলেও মেজাজ আদৌ সাহেবি নয়। ধুতি-কামিজ উড়ানি পরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হন। চাপরাশী ব্যাগ লইয়া যায়। সেই ব্যাগে আপিসের পোষাক থাকে। আপিসে নিজের কামরায় গিয়া পোষাক পরিবর্তন করিয়া কাজ করিতে সুরু করেন। আবার কাজ শেষ হইলে, ধুতি-কামিজ পরিয়া আপিস হইতে বাহির হন। চাপরাশী ব্যাগে পোষাক ভরিয়া সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে। গ্রামের লোকে ও কলিকাতার বাসার আশ-পাশের লোকেরা চিরদিনই তাঁহাকে ধুতি-কামিজ ও উড়ানি-পরা অবস্থাতেই দেখিতে অভ্যস্ত। তিনি যে অপিসে নিখুঁত সাহেবি পোষাক পরিয়া আপিস করেন, দুইজন চাপরাশী যে তাঁহার কামরার বাহিরে উৎকর্ণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ বসিয়া থাকে, কখন ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে—কেরানীদের কোনো কাজের জন্য কাছে ডাকিলে তাহারা তটস্থ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শীতের দিনেও যে ঘামিতে

থাকে, ইহা চন্দ্রনাথবাবুর আপিসের মধ্যে না থাকিলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য হইত না।

বাড়ীতে তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। অতি উচ্চ বংশ—নৈকষ্য কুলীন। বংশমর্য্যাদা একটু রাখিয়া চলেন। তিনটি মেয়ের বিবাহ ঠিক পাল্‌টা-ঘরে দিয়াছেন। ছেলেও তিনটি। অমর-ই বড় ছেলে—বৎসর-কুড়ি বয়স। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. পড়িতেছিল—এইবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। অমরের বড় একটি বোন্। ছোট এক ভাই সমর, সে এখনও স্কুলে পড়ে। বয়স, দশ বৎসর।

অমর খুব মেধাবী ছাত্র, ম্যাট্রিকুলেশনে বৃত্তি লইয়া পাশ করে। আই. এ.তেও বৃত্তি পায়। কলিকাতায় পড়িবার সময় হইতে চন্দ্রনাথবাবু সপরিবারে কলিকাতায় বাসা করিলেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিবার পর আবার তাঁহাদের কিছুদিন দেশে থাকিবার সাধ হওয়ায় সকলকে লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন।

মনোহরকে আগাইয়া দিয়া অমর বাড়ীর ভিতর গিয়া দেখিল, তাহার পিতা উঠিয়াছেন, হাত-মুখ ধোয়াও হইয়া গিয়াছে। তিনি আহ্নিকে বসিয়াছেন। উনানে চায়ের জল চড়িয়াছে।

পিতার আহ্নিক শেষ হইলে, অমর বলিল—বাবা, আজ আপনি এরি মধ্যে উঠে হাত-মুখ ধুয়েছেন—আমি তা জানতেই পারিনি। মাষ্টারমশাই মনোহরবাবু এসেছিলেন, আপনার

কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বললাম, 'বাবার শরীর খারাপ ব'লে আজকাল উঠতে একটু দেরী হয়।' তিনি ব'লে গেলেন, আর-একদিন এসে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন।

চন্দ্রনাথবাবু বলিলেন—তুমি কেন আমাকে ডাকলে না, বাবা? আমি খুব সকালে উঠি না, কিন্তু বিছানায় তো জেগে থাকি। তাঁকে চা খাইয়েছো তো?

অমর। তিনি চা খেতে চাইলেন না। বললেন—চা আর খাবেন না।

চন্দ্রনাথ। কেন, তিনি এত চা খেতেন, হঠাৎ ছেড়ে দিলেন যে?

অমর। আয় তো বাড়াতে পাচ্ছেন না—খরচ যদি একটু কম করতে পারেন সেইজন্যে। বললেন—লতিকা চায়ের জল চড়িয়েছিল, তিনি ব'লে বেরিয়েছেন, চা খাবেন না…যদি তাদের ইচ্ছা হয় তারা খেতে পারে। তাঁর কথার ভাবে বোধ হলো, খুব অর্থকষ্টে পড়েছেন, আর মনেও খুব আঘাত পেয়েছেন! মাইনে পান মাত্র চল্লিশ টাকা—অথচ এত ভালো টিচার। ওরকম History পড়াতে কলেজেও দেখিনি।

চন্দ্রনাথ। বড়ই দুঃখের বিষয়! আমরা এ-সময়ে তাঁর কি উপকারে আসতে পারি ভেবে দেখ।

অমর। সময় তো এখন এখানেই পড়বে…আমি যেমন

তাঁর কাছে পড়তাম, সমরও যদি তাঁর কাছে পড়ে তা'হলে ভালো হত।

চন্দ্রনাথ। ঠিক বলেছো। তাই পড়ুক সমর। কত ক'রে দেওয়া যাবে?

অমর। সে আপনি বলুন। আমি আজ বিকালে তাঁর কাছে যাবো, গিয়ে তাঁকে ব'লে আসবো।

চন্দ্রনাথ। তুমি কত ক'রে দিতে?

অমর। পনেরো টাকা।

চন্দ্রনাথ। এবার কুড়ি টাকা ক'রে দিয়ো।

অমর। সেই ভালো হবে বাবা! আমি আজ গিয়ে তাঁকে ব'লে আসবো যাতে কাল থেকেই পড়াতে আসেন।

অমর বেলা পাঁচটা-আন্দাজ মনোহরদের বাড়ীতে গেল। মনোহর ও রামপ্রসাদ তখনও ফেরে নাই। মেয়েরা সবাই আছে।

অমর তিন বৎসর মনোহরের কাছে পড়িয়াছে। মনোহর পড়াইতে যাইত। কখনো-কখনো মনোহরের শরীর খারাপ থাকিলে নিজে ইচ্ছা করিয়া বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া যাইত। সেই-সূত্রে সকলের সঙ্গেই তাহার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তখন হইতে সুহাসিনীকে সে কাকীমা বলে, লতিকারা অঁমর-দা বলিয়া ডাকে। কলিকাতায় গিয়াও যখন মধ্যে মধ্যে

বাড়ী আসিত, অমর দেখা করিয়া আসিত। ইদানীং বৎসর-দুয়েক একেবারে আসে নাই।

অমর আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল—রামু!

তখন মেয়েরা ও সুহাসিনী রান্নাঘরে, কেহই শুনিতে পাইল না। অমর ভিতরে আসিয়া ডাকিল—কাকীমা!

লতিকা বাহিরে আসিয়াই অমরকে দেখিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে লতিকা প্রায় কিশোরের মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিল। প্রথম কলিকাতা গিয়া মাঝে-মাঝে অমর যখন আসিত, তখনও তাহার মধ্যে যে কোনো পরিবর্ত্তন আসিয়াছে তাহা মনে হয় নাই। লতিকা আজ দুই বৎসর পরে অমরকে একেবারে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহের উপর যৌবন এক মধুরিমা বুলাইয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার দেহের শ্যামবর্ণ যেন শ্রীকৃষ্ণের নবঘন শ্যামে পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘ বাহু ও সুকৃষ্ণ আয়ত চক্ষু সেই শ্যাম-মূর্ত্তিকে বড়ই মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

আরও দুই বৎসর পূর্ব্বে অমর লতিকাকে দেখিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ যাহাকে দেখিল সে লতিকার শান্ত-মূর্ত্তি। এমন গৌরী-শ্রী আর কোনোদিন তাহার চক্ষে পড়ে নাই। এই সুমধুর প্রথম যৌবনের অপরূপ লাবণ্য সর্ব্বদেহে ভরিয়া, চক্ষে এক অপরূপ শ্যামাঞ্জন মাখিয়া বিহ্বল-দৃষ্টিতে লতিকা আজ যেন প্রথম তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। দু'জনেই মুগ্ধদৃষ্টিতে দু'জনকে দেখিল। এ দুর্লভ দৃষ্টি দিয়া নর ও নারী পরস্পরকে একবার

মাত্র দেখিতে পায়, পরে সহস্রগুণে সুন্দর-সুন্দরীকে দেখিলেও সে-দৃষ্টি আর মিলে না। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত মাত্র! পরক্ষণে লতিকা বলিল—একি, অমর-দা যে। এসো! কবে এলে?

অমরেরও এতক্ষণে চমক ভাঙিল, বলিল—এখানে কাল এসেছি। তোমরা সব ভালো আছো ত'?

অমর উঠিয়া আসিল।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে সুহাসিনী বলিল—কি রে লতু?

লতিকা বলিল—অমর-দা এসেছেন, মা।

সুহাসিনী বাহিরে আসিলেন, অমর প্রণাম করিল।

সুহাসিনী কুশল প্রশ্নাদি করিয়া বলিল—আজকাল তো তুমি আর আসো না বাবা—আগে কত আসতে।

অমর বলিল—আমরা বছর-দুই একেবারে বাড়ী আসতে পারিনি। নইলে, এসে আমি আপনাদের কাছে না এসে যাই না। এবার মোটে কাল সন্ধ্যায় এসেছি। সকালবেলা স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাই তখন আর আসিনি। স্যার এখনো ফেরেননি, কাকীমা?

সুহাসিনী। ছ'টা নাগাদ ফেরেন।

অমর। এত দেরী হয় যে? ওখান থেকে কি কাউকে পড়াতে যান নাকি?

সুহাসিনী। ইস্কুলে বুঝি পাঁচটা ছেলে পড়ে। দশটা টাকার জন্যে তাদের সবাইকে দু'ঘণ্টা পড়াতে হয়। খুব বেশী

দেরী নেই আর। তুমি এদের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করো।...লতু, যা তো মা, ওঁর ঘরে অমরকে বসতে দিয়ে আয়।

লতিকা তাহার পিতার ঘরের দুয়ার খুলিয়া অমরকে বসিতে দিল। এই ঘরটিই বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঘর। দিনের বেলা লোকজন আসিলে বসিতে দেওয়া হয়।

ঘরটির সহিত অমর বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। ঘরটি তার শিক্ষকের প্রিয় পুস্তকে পূর্ণ। এবার আসিয়া দেখিল, দুটি সেল্‌ফ্‌ বাড়িয়াছে—একটিতে লতিকার বই, অপরটিতে যূথিকা ও রামপ্রসাদের বই থাকে।

কি কথা কহিবে তারা ঠিক করিতে না পারিয়া অমর একটা সেল্‌ফের কাছে গিয়া বইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। তারপর বলিল—লতু, তুমি তো অনেক বই প'ড়ে ফেলেছো এর মধ্যে। তোমার বাংলা আর ইংরেজী বইয়ের **selection** (নির্ব্বাচন) বড় সুন্দর হয়েছে। এগুলো সব পড়া হয়েছে তোমার ?

লতিকা সলজ্জভাবে বলিল—হ্যাঁ।

অমর। এখন তাহ'লে কি পড়ছো ?

লতিকা। ওইগুলোই **revise** করছি। বাবা বলেছেন—প্রত্যেক বইখানি পড়তে হবে, আর সেই বইখানির সার কথা (**substance**) সংক্ষেপে লিখতে হবে।

অমর। কতগুলো ও-রকম লেখা হয়েছে ?

লতিকা। বাংলা সব হয়েছে।

অমর। History পড়েছো ?

লতিকা। হ্যাঁ, শুধু ভারতবর্ষের পড়েছি। আর ইংলণ্ডের ইতিহাস ও জিওগ্রাফি (Geography) বাবা মুখে-মুখে শেখান আর নোট করিয়ে দেন।

অমর। তবে তো তুমি সব-বিষয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়িয়ে গিয়েছো। Mathematics কি পড়েছো ?

লতিকা। শুধু পাটীগণিত ভালো ক'রে শিখেছি। Algebra ও Geometry'ও কিছু জানি। বাবা, বাংলা আর ইংরেজী ভালো ক'রে শিখতে বলেন, স্কুল থেকে সেইজন্যে ছোট-ছোট বই এনে দেন। সে-সব বই শীগ্‌গির শেষ ক'রে আবার ফেরত দিতে হয়।

অমর। দেখি তোমার নোট।···কি-রকম নোট রেখেছো দেখি।

লতিকা দু'খানি মোটা বাঁধানো খাতা অমরের সম্মুখে রাখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে গেল।

মিনিট-দশেক পরে সে একহাতে চায়ের পেয়ালা, অপর-হাতে চারখানা ছোট লুচি ও খানকয়েক আলুভাজা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তারপর সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল—মা বল্‌লেন, খাও।

লতিকার নোট হইতে মুখ তুলিয়া অমর হাসিয়া বলিল—তুমি বুঝি বলবে না!

লতিকা হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

অমর বলিল—সুন্দর নোট করেছো তুমি। খাসা হয়েছে। তোমার যে পড়া খুব ভালো হয়েছে, তা তোমার নোট দেখেই বোঝা যায়। স্যার তোমাকে বেশ ভালো ক'রে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। লেখায় তুমি শীগ্‌গির আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে!

লতিকা বলিল—তুমি ঠাট্টা করছো অমর-দা। আমার মত বয়সে কত মেয়ে আই. এ. পড়ছে।

অমর। তা পড়ুক, তাদের চেয়ে তোমার সত্যিকারের জানা ঢের বেশী হয়েছে।

লতিকা লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু আনন্দে তাহার সারা চিত্ত ভরিয়া গেল।

অমর খাবার খাইয়া চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—সুন্দর চা হয়েছে। তুমি করেছো?

লতিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার মত বয়সে সংসারের সকল কাজ করা উচিত—চা তো কিছুই নয়।

অমরও হাসিয়া বলিল—তোমার মতে তাহ'লে তোমার মত বয়সে একেবারে সব-জান্তা ও সব-পার্‌তা হওয়া উচিত।

লতিকা আবার হাসিয়া ফেলিল।

অমর জিজ্ঞাসা করিল—হাসলে যে ?

লতিকা বলিল—তোমার মুখে নতুন কথা শুনে।

অমর। কি নতুন কথা ?

লতিকা। এই—'সব-পার্‌তা'।

অমর। ও। ওটি সব-জান্‌তার মাসতুতো ভাই। সব জান্‌তা যদি হয়, সব-পার্‌তা হবে না কেন ?

লতিকা। তা তো বটেই।

কথা কহিতে-কহিতে চা পান শেষ হইয়া গেল লতিকা খাবারের শূন্য পাত্র ও চায়ের খালি পেয়ালা লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমর তখন লতিকার ইংরেজী বইয়ের নোট লইয়া পড়িতে লাগিল! অমর দেখিল, পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ভালো-ভালো অনেকগুলি ইংরেজী বই লতিকা পড়িয়াছে, আর বেশ সরল ও মিষ্টি ভাষায় তাহার নোট রাখিয়াছে। অমর দেখিল, অঙ্কশাস্ত্র বাদ দিলে লতিকা বেশ ভালোভাবে I. A. standard-এ পড়িতেছে। ঘরে পড়িয়া, গৃহকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া অল্প-অবসরের মধ্যে যাহা সে পড়িয়াছে তাহা অতিশয় প্রশংসার যোগ্য।

অমর যখন নিবিষ্টচিত্তে লতিকার নোটগুলি পড়িতেছিল, লতিকা তাহার মধ্যে বার-দুই আসিয়া, অমরকে তাহার নোট একমনে পড়িতে দেখিয়া লজ্জায় ও একপ্রকার আনন্দে ফিরিয়া

গিয়াছিল ও খুব চটপট করিয়া মায়ের কার্য্যে সহায়তা করিতেছিল।

সুহাসিনী একবার বলিল—তুমি অমরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওগে, যূথি রুটি ক'খানা বেলে দিচ্ছে।

লতিকা বলিল—অমর-দা বই পড়ছেন, আমি চট্ ক'রে বেলে দিয়ে যাচ্ছি। যূথি ততক্ষণ খোকাকে নিয়ে একটু বেড়াক।

যূথিকা রান্নাঘর হইতে ছাড়া পাইয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া অমরের ঘরের দিকে আসিল। তারপর দাপাদাপি করিতে-করিতে আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—ও দিদিভাই, অমর-দা তোমার লেখা নোট পড়ছেন।

লজ্জায় লতিকার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মাথা নীচু করিয়াই সে রুটি বেলিতে লাগিল। মনে-মনে যূথিকার উপর রাগ করিয়া ভাবিল, ভারি নতুন খবর নিয়ে এলেন! এ কথাটা আর মায়ের কাছে এসে না বল্লে হতো না? মেয়ে যেন কি!

মেয়ে ততক্ষণ অমূল্য সংবাদ দিয়াই রান্নাঘর ত্যাগ করিয়াছে। সুহাসিনী একবার অপাঙ্গে কন্যার লজ্জানত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। মনের মধ্যে একটা কথার উদয় হইল···জোরে একটা নিশ্বাস পড়িল। নিশ্বাসের শব্দে লতিকা মুখ তুলিয়া চাহিল। দেখিল, মা উনানের দিকে মুখ ফিরাইয়া একমনে রুটি সেঁকিতেছেন!

রামপ্রসাদ বাহির হইতে ডাকিল—মা!

সুহাসিনী বলিল—আয়।...একবারে হাত-মুখ ধুয়ে আয়, খাবার হয়েছে।

মনোহর আপনার ঘরে ঢুকিয়া অমরকে দেখিয়াই বলিল—এই যে অমর, কতক্ষণ এসেছো?

অমর বলিল—ঘণ্টাখানেক হলো এসেছি। আপনি স্কুলের এই খাটুনির পর সঙ্গে-সঙ্গে টিউশনি করেন কেন আর?

মনোহর। কি করি অমর! নইলে যে কুলুতে পারি না। এই সময়ে তবু পাঁচটা ছেলেকে একসঙ্গে পাওয়া যায়, যা দেয় তাই লাভ। তবু তো কিছু কাজে লাগে!

অমর। আপনি শ্যার হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, আমি ব'সে আছি।

মনোহর হাত মুখ ধুইতে গেল। যূথিকা খবর দিয়া গেল, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

মনোহর যখন রান্নাঘরের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে, সেইসময় রামপ্রসাদ ভিতর হইতে বলিল—মা, আর রুটি নেই?

সুহাসিনী উত্তর দিল—আর তো বেশী নেই বাবা! সবার জন্যে দু'খানা ক'রে আছে। তা, তুই আর একখানা নে!

রামপ্রসাদ বলিল—না মা, আর খাবো না! দিদিদেরও তো খিদে পাবে। বরং সকাল সকাল ভাত দিয়ো'খন। আর, আজ আমি ইস্কুলে দু'পয়সার খাবার খেয়েছি।...আমি বললাম, খিদে পায়নি, বাবা তবু শুনলেন না।

এতদিন পরে আজ খাবার দেওয়ার কারণ সুহাসিনী বুঝিল, কিছু বলিল না।

এমন সময়ে মনোহর ঘরের মধ্যে আসিল। তাহার পাতেও দু'খানা রুটি ও একটু তরকারি ছিল। রামপ্রসাদ উঠিয়া যাইতেছিল, মনোহর তাহাকে বসিতে বলিয়া, পাত হইতে একখানি রুটি ও একটু তরকারি তুলিয়া দিল।

রামপ্রসাদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—বাবা, আমি যে এইমাত্র খেয়ে উঠছি। আমাকে আবার কেন দিলেন?

মনোহর গম্ভীরমুখে বলিল—তুই খা তো বাবা, বেশী বকিস্‌নি। ছেলেমানুষের বেশী বকা ভালো নয়।

রামপ্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ধীরে-ধীরে খাইতে লাগিল—পাছে ওখানা উঠিয়া গেলে, পিতা আবার নিজের হইতেও কিছু তুলিয়া দেন।

মনোহর আধখানা রুটিতে তরকারিটুকু লইয়া খাইয়া ফেলিল ও পরে জল পান করিয়া উঠিল। পাতে আধখানা পড়িয়া রহিল।

সুহাসিনীর সন্দেহ হইল, তাহাদের মাতাপুত্রের কথা বোধহয় মনোহর শুনিয়াছে! তাহার মনে একটা আঘাত লাগিল, বলিল—ও আধখানাই-বা থাকে কেন, কাউকে দিয়ে দিলে হতো।

মনে তখন তাহার ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত স্বামীর জন্য সমবেদনা

জাগিতেছিল, কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হইল তাহাতে সমবেদনার চিহ্ন কিছু ছিল না।

স্বামী উত্তরে কিছু না বলিয়া একটু ম্লান হাসিয়া উঠিয়া পড়িল ও ধীরে-ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

সুহাসিনীর চোখে জল আসিল। সবার অলক্ষ্যে সে তাহা নীরবে মুছিয়া ফেলিল।

*

* *
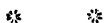
সুহাসিনী সংসার খরচের যে টাকা পাইত, পরের মাসে তাহা হইতে দশ টাকা বেশী পাইল। তাহাতে সংসারের সচ্ছলতা একটু হইল বটে, কিন্তু অশান্তি হইল তার চেয়ে বেশী। সুহাসিনী হিসাব করিয়া দেখিল, স্বামী পূর্ব্বের অপেক্ষা সকালে ঘণ্টা-দুয়েক ও রাত্রেও ঘণ্টা-দুয়েক, কখনো-বা বেশী বাহিরে থাকেন, অথচ টাকা যাহা বেশী দেন তাহা মাত্র দশটি। মাসিক এই দশটি টাকার জন্য কি তাঁহাকে প্রতিদিন চার ঘণ্টা করিয়া খাটিতে হয়? যদি তাই হয়, এত খাটুনির কি দরকার? সত্য বটে, টাকা কিছু বেশী হইলে সাংসারিক-সচ্ছলতা এবং সঙ্গে-সঙ্গে শান্তি কিছু বাড়িবে! কিন্তু শরীর যেখানে চলিবে না, সেখানে সে-চেষ্টার কি প্রয়োজন! ইহার উপর বাড়ী আসিয়া মেয়েদের পড়ানো আছে। তারপর রাত্রি জাগিয়া অমরের কথামত কি একখানা বই আরম্ভ করিয়াছেন। কি হইবে এইসব লিখিয়া? যৌবনাবধি তো লেখাপড়া লইয়াই রহিলেন, কিন্তু কি সুফল হইল তাতে?

একদিন কথাটা স্বামীকে বলিবে-বলিবে করিয়া সুহাসিনীর মাস-তিন-চার কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রি দশটার পর শ্রান্ত দেহে ও শুষ্ক মুখে স্বামী গৃহে ফিরিতে, সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

মনোহরের মুখে একটু কঠিনতা ফুটিয়া উঠিল; কহিল—কি করবো বলো, অন্নচিন্তা। সংসার তো চালাতে হবে।

সুহাসিনীর মনে স্বামীর শুষ্ক-মুখের জন্য করুণাই জাগিতেছিল, কিন্তু শুষ্ক-কথায় শুষ্ক উত্তরই আসিয়া পড়িল—এমন সংসার না করলেই তো হয়। এই যে সকাল-সন্ধ্যে বাড়তি খাটচো, তার জন্যে কত দিচ্ছে, শুনি? দশ টাকার জন্যে এত ভূতের খাটুনি কেন?

উত্তর হইল—ভূত যে সে ভূতের মতই খাটিবে, দেবতার মত খাটিবার ক্ষমতা সে পাইবে কোথায়? দেবতা অল্প খেটে বেশী টাকা উপায় করে, কিন্তু ভূত তো তা পারে না···তাকে বেশী খেটে কম টাকা উপায় করতে হয়। এই তার ভাগ্য।

সুহাসিনী একটু ঝাঁঝের সহিত বলিল—টাকার কথা আমায় কেন বলো, আমি কি তোমার টাকার প্রত্যাশী? বেশী উপায় করো, তোমার ছেলে-মেয়ে সুখে থাকবে, কম উপায় করো, তারা কষ্ট পাবে। আমার কি? আমার ভালো খাওয়ার পরার জন্যে তোমাকে কখনো বলিনি, আজও বলবার ইচ্ছে রাখি না। তখন আর আমাকে টাকার খোঁটা দাও কোন্ মুখে!

মনোহর শুষ্ককণ্ঠে বলিল—আমি তো টাকার খোঁটা দিইনি, তুমিই তো টাকার কথা তুল্‌লে। বলিয়া আর কথা বাড়াইবার ইচ্ছা না করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী খানিকক্ষণ কক্ষমধ্যে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। তারপর মনে-মনে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে-দিতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

বাহিরে ঘোর অন্ধকার। আকাশে অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু তাহাদের আলোক ধরণীতে নামিবার বহুপূর্ব্বে শূন্যপথে মিলাইয়া যাইতেছে। একপাশের কক্ষে বসিয়া লতিকা তখনও নিবিষ্ট-মনে পড়িয়া যাইতেছে। রামপ্রসাদ জাগিয়া থাকিয়া পড়িবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও, দিদির পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের পড়িবার ইচ্ছা অপেক্ষা, পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই যে এই ছেলে-মেয়ে দুইটির পড়িবার ইচ্ছা বেশী, সে-কথা মনোহরের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কই, সন্তোষের আলোক যে এখনও বহু ঊর্দ্ধে! দরিদ্রের দুঃখ ও হতাশার দীর্ঘশ্বাসের এখনও তো কোনো প্রতিকার হইল না?

আরো খাটিবে, কিন্তু সময় কই? আর, সময় থাকিলেও সে-সময়টুকু মূল্য দিয়া ক্রয় করিবে কে? এ-সমস্ত দুঃখের মূলে অভাব দূর হইলেই দুঃখ আর থাকিবে না। স্নেহ প্রেম কিছুই তো সংসারে কম ছিল না! কিন্তু অভাব আসিয়া যে ধীরে-ধীরে সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিল। এ অভাব কি ভাগ্যের মত শাশ্বত ও অমোঘ হইয়া রহিয়া যাইবে, না, মেঘের মত একদিন কাটিয়া যাইবে! তাহার জীবদ্দশায় না হউক, মরণের পরেও যদি এ-অভাব দূর হয়, তাহা হইলেও তাহার ক্ষোভ নাই। কিন্তু তাহাই কি যাইবে? যাক্ না যাক্, সে এ-চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। জীবনের শেষ-ক্ষণ পর্য্যন্ত

এ-চেষ্টা সে ছাড়িবে না। দুঃখের জন্য আর দুঃখ করিবে না। দুঃখ তো জীবন-ভোর। জীবন! সে তো আর নূতন-কিছু নয়, মরণের দুয়ারে পৌঁছিবার সময়টুকু মাত্র। একটা দিন কাটানো মানে, মরণের দিকে একটি দিন আগাইয়া যাওয়া মাত্র। তখন আর ভয় কিসের?

হঠাৎ সুহাসিনীর ডাকে চমক ভাঙিল—রাত বারোটা বাজে, সে হুঁস আছে? এখন দুটো খাও, খেয়ে আমাকে ছুটি দাও। আমারও তো মানুষের শরীর, লোহার নয় যে, চব্বিশ ঘণ্টা সমান বইবে।

কথাগুলো তীক্ষ্ণ-কণ্ঠেই সুহাসিনী বলিয়াছিল। মনোহর আর-একবার আকাশের পানে চাহিয়া গৃহমধ্যে আসিল। সেইখানেই খাবার দেওয়া হইয়াছিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনোহর খাইতে বসিল! পাঠরতা লতিকারও চমক ভাঙিল। সে বই বন্ধ করিয়া ভাইকে ভালো করিয়া শোয়াইয়া দিয়া উঠিয়া আসিল। লতিকা আসিতেই সুহাসিনী বলিল—পড়া শেষ হলো এতক্ষণে? এখন একটিবার রান্নাঘরে যাও। ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে ব'সোগে।

লতিকা চলিয়া গেল।

আহার্য্যের সম্মুখে পিলসুজের উপর একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মনোহর গায়ের জামা খুলিয়া খাইতে বসিয়াছিল। সুহাসিনীর চক্ষু হঠাৎ স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। সেই দেহ কি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে! প্রায় চেনা

যায় না। অধর মলিন হইয়া গিয়াছে...নাসিকা অসির মত উঁচু হইয়া আছে...দুই পাশের হাড় উঁচু হইয়া আছে। যেন সে-মনোহর নয়। পূর্ব্বের সেই স্বাস্থ্য, সেই সৌন্দর্য্য যেন কোথায় চির-বিদায় লইতে বসিয়াছে!

তা, হইবে না? এত পরিশ্রমে মানুষের শরীর টিকে? রাত্রে একটু বিশ্রাম ছিল...সেটুকুও গিয়াছে। মাসিক দশ টাকার জন্য সে-বিশ্রামটুকু নষ্ট করিয়া শরীরকে এমন করিয়া কষ্ট দেয়...সাধে কি সুহাসিনী রাগ করে! দশ টাকার জায়গায় যদি পঞ্চাশ টাকা ঐ বিশ্রামের পরিবর্ত্তে স্বামী আনিয়া দিত, তবু সুহাসিনীর রাগ কমিত না। স্বামী তো সেটুকু বোঝে না...তাই তো তাহার দুঃখ!

হঠাৎ মনোহর আহার শেষ করিয়া জলের গ্লাসে হাত দিতেই সুহাসিনী বলিল—ওকি খাওয়ার ছিরি হচ্ছে দিন-দিন। সব যে পাতে প'ড়ে রইলো। আর দুটো খাও। এম্‌নি ক'রে শরীর কতদিন বইবে, শুনি?

—জানো তো, দুঃখীর শরীর, না বইলে চলে না—বইতেই হবে। বলিয়া মনোহর উঠিয়া পড়িল। তারপর হাত-মুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির খাতা লইয়া বসিল।

সুহাসিনী খানিকটা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর উচ্ছিষ্টাদি কুড়াইয়া, থালা উঠাইয়া যখন বাহিরে আসিল তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌-টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে আর অন্তরের মধ্যে অভিমানের প্রবল ঝটিকা বহিতেছে।

মনোহর কিছুক্ষণ ধরিয়া লিখিয়া গেল। একবার লেখা বন্ধ করিয়া লক্ষ্য করিল—সুহাসিনী তখনও ঘরে আসে নাই। আবার খানিকটা লিখিয়া গেল, তথাপি সুহাসিনীর দেখা নাই। অন্য রাত্রে তাহার আহার সারিয়া আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সুহাসিনী কার্য্য সারিয়া আসিত। কিন্তু আজ এত বিলম্বের কারণ কি?

মনোহর লেখা বন্ধ করিয়া উঠিল। রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল—উচ্ছিষ্ট থালা-বাসন সব ধুইয়া ঘরের একপাশে সজ্জিত রহিয়াছে। একটু দূরে একখানি ছোট থালায় এক-ছটাক চালের ভাত, তাহার উপর একধারে ডালের সামান্য একটু চিহ্ন ও তাহারি কাছে ঈষৎ একটু তরকারি বোধহয় সুহাসিনীর আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মনোহর সত্য-সত্যই শিহরিয়া উঠিল। দিনরাত্রি প্রাণান্ত পরিশ্রমে সকলের আহার যোগাইয়া, সুহাসিনীকে এই খাইয়া থাকিতে হয়! তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, তবুও এখনো কাজের শেষ হয় নাই। তখনো উনানে তাওয়া চাপানো!

ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকখানি রুটি বেলিয়া লইয়া সুহাসিনী তাড়াতাড়ি সেগুলি সেঁকিয়া লইল। তারপর পাত্রাদি সব যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া যখন খাইতে বসিল তখন তাহার দুইচক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। অঞ্চল দিয়া অশ্রুধারা মুছিয়া সুহাসিনী সেই স্বল্প অন্নের দুই মুঠা গলাধঃকরণ করিয়া জলের গেলাস মুখে তুলিল।

মনোহর নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া কেবল এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এত দুঃখে সে সুহাসিনীকে রাখিয়াছে···আবার নিজে বালকের মত অভিমান করে! ছোট ছেলে-মেয়েরা পাশের শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে লতিকা, কণিকা ও রামপ্রসাদ ঘুমাইতেছে। সে তো ইচ্ছা করিয়াই জাগিয়া আছে। আর সুহাসিনীকে বাধ্য হইয়া এখনো সংসারের খাটুনি খাটিতে হইতেছে। কয়দিন বেশী সকালে বাহির হইয়াছিল, জল খাওয়া তাহার পূর্বে হইয়া উঠে নাই। তাই আজ রাত্রে আগে হইতেই সকালের খাবার তৈয়ারি করিয়া তবে সুহাসিনী খাইতে বসিল, ইহা মনে করিতে মনোহরের অনুতাপের সীমা রহিল না।

একটু পরে সুহাসিনী ম্লানমুখে ঘরে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল। শয্যায় আসিয়া ছেলে-মেয়েদের একটু সরাইয়া ঠিক করিয়া শোয়াইয়া আপন শয্যায় শুইয়া পড়িল। স্বামীর কখন কাজ শেষ হইবে এবং কখন শুইবে তাহা স্বামীই জানে। সকাল করিয়া শুইতে বলিয়া কোনো ফল নাই জানিয়া ইদানীং সুহাসিনী এ-কথা বলা ছাড়িয়া দিয়াছে।

মনোহর আলো কমাইয়া দূরে রাখিয়া দিয়া, সুহাসিনীর শিয়রের কাছে বসিল ও ধীরে-ধীরে বলিল—রোজ কি তোমায় এইরকম খেয়ে থাকতে হবে?

সুহাসিনী চমকিয়া উঠিল। স্বামীর এ কণ্ঠস্বর যেন অনেক-

দিনের আগেকার—প্রায় ভুলিয়া-যাওয়া। মমতা-মাখানো এ-স্বরে বুঝি-বা হারাণো-প্রেমের সুরও একটু মাখানো আছে। তাই প্রথমটা সে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—কি খেয়ে ?

মনোহর স্নিগ্ধ ও অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল—আমি আজ তোমার খাওয়া দেখেছি। এই খাওয়া খেয়ে আর এই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, মানুষের সাধ্য নেই যে, মেজাজ ঠিক রাখে। এর উপর আমি তোমায় যে দুঃখ দিয়েছি তার জন্যে আমায় মাপ করো।

বলিয়া মনোহর তাহার শীতল হস্ত সুহাসিনীর ললাটের উপর রাখিল।

বহুদিন—বহুকাল পরে সুহাসিনী যেন স্বামীর প্রেম ফিরিয়া পাইল। স্বামীর হাতখানি দুই হাত দিয়া টানিয়া আপনার বুকের কাছে আনিয়া কি বলিতে গিয়া সুহাসিনী উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল।

---

*

*　　*

অমরের অনার্সে বি. এ. পাশের খবর আসিল। অমরকে এম. এ. ও বি. এল. একসঙ্গে পড়িবার জন্য আবার কলিকাতায় যাইতে হইবে। ছুটির সময়ের অনেকখানি সে লতিকার সাহায্যে কাটাইয়াছে। মাস-দুয়েকেই সে ললিতাকে মোটামুটি সংস্কৃত শিখাইয়া দিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশনে যেটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, লতিকা তার আপনার পরিশ্রমে ও অমরের সাহায্যে খুব শীঘ্র আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। অমরের বিশেষ ঝোঁক, যাহাতে লতিকা প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেয়···মনোহরকেও সে বিশেষ করিয়া ইহার জন্য বলিয়াছে এবং মনোহর তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অমর, মনোহরদের বাড়ী বিদায় লইতে আসিল। মনোহর ও সুহাসিনীকে প্রণাম করিয়া, ছোটদের সাদর সম্ভাষণ করিয়া, লতিকার পড়িবার ঘরে আসিয়া বলিল—লতু, আজ যাচ্ছি।

লতিকা কিছু বলিল না। শুধু তাহার ম্লান মুখ তুলিয়া একবার চাহিল।

অমর বলিল—তুমি বেশ ভালো ক'রে পড়ো। নিশ্চয়ই তুমি ভালো ক'রে পাশ করবে, দেখো। আর-এক কাজ ক'রো,

আমি মাঝে-মাঝে তোমাকে অনেক ভালো-ভালো মাসিকপত্র ও বই পাঠিয়ে দেব, সেগুলিও প'ড়ো। পড়বে তো?

লতিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, পড়িবে। মুখে কিছু বলিল না। পাতলা ঠোঁট দু'খানি কি যেন বলি-বলি করিয়া বার-দুই কাঁপিয়া স্তব্ধ হইল।

তখন অমরকেই আবার কথা কহিতে হইল—আজ যাবার সময় একটা কথা না ব'লে যেতে পারছি না, লতু! কতবার তো বাড়ী থেকে গেছি, একলাও থেকেছি, কিন্তু এবারকার মত মনের অবস্থা কখনও হয়নি। যেতে ইচ্ছে করছে না। যত ভাবছি এই যাবো এই যাবো, মন তত ছুটে এসে তোমার এই ছোট ঘরখানিতে দাঁড়াচ্ছে। কেবল আমার মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে একসঙ্গে এক-জায়গায় যদি পড়তে পেতাম—পড়ার সার্থকতা দশগুণ বেড়ে যেতো।

অমর যাইবে শুনিয়া লতিকার সারা চিত্ত বেদনায় টন্-টন্ করিতেছিল। অমরের এই কথা শুনিয়া তাহার অন্তরের যে-অশ্রু বেদনার বাঁধনে বাঁধা ছিল, সে বাঁধন কাটিয়া নেত্রপ্রান্তে দেখা দিল ও মুক্তার মত একটির পর একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

চোখে জল দেখিলে মানুষের প্রাণে যে আনন্দের বেদনা জাগে, অমর তাহা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিল। প্রথম দর্শনে দুইজনের অন্তরে প্রেম জন্মলাভ করিয়া, সাহচর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়া, অশ্রু-জলের স্পর্শে অমর হইয়া উঠিল।

অমর বলিল—তুমি চুপ করো লতু। আমি তোমাকে নিয়ম ক'রে চিঠি দেব। তুমি কিন্তু উত্তর দিও! ছুটি পেলেই আমি আবার আসবো।

অমর এবার যাইতে উদ্যত হইল। লতিকা অমরকে প্রণাম করিল ও চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমর আর-একবার ম্লানমুখী লতিকার পানে চাহিয়া ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল। এই তাহার জীবনের প্রথম প্রণয়···প্রণয়ের প্রথম বেদনা···প্রণয়ের প্রথম আনন্দ! বাহিরে আসিয়া অমর লতিকার ঘরের পানে চাহিতেই তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। জোর করিয়া মুখ ফিরাইয়া অমর পথ চলিতে লাগিল।

অমর যখন কলিকাতাগামী ট্রেণে আসিয়া উঠিল তখন দুঃখের মধ্যেও অমরের আনন্দের অবধি ছিল না।

মানুষ পথ চলিতে-চলিতে কোনো জিনিস কুড়াইয়া পাইয়া, যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখার পর যদি সে জানিতে পারে যে, সেই কুড়াইয়া-পাওয়া জিনিস অমূল্য রত্ন, তখন তাহার যেমন আনন্দ হয়, অমরের আনন্দও আজ সেইরূপ। বহুবার-দেখা লতিকাকে এবার দেখিবামাত্র অমরের বড় ভালো লাগিয়াছিল। কিন্তু সে যে এত ভালো, সে যে অমৃতের চেয়ে কল্যাণকর, চন্দ্রকিরণের চেয়েও স্নিগ্ধ, মধুর সঙ্গীতের চেয়েও মনোরম, আজিকার এইক্ষণের পূর্বে অমর তাহার এতটুকুও বুঝিতে পারে নাই। লতিকার কথা—লতিকার নিঃশ্বাস—লতিকার রূপ

তাহার সমস্ত হৃদয় এমন করিয়া জুড়িয়া রাখিয়াছে যে, সে-কথা আজ কিছুক্ষণ আগেও বুঝিতে পারে নাই। লতিকা যে তাহাকে মনে রাখিবে, গোপনে তাহাকে ভাবিবে, সেও যে লতিকার স্মৃতি অমূল্য রত্নের মত অন্তরে সংগোপন রাখিবে, এই অভিনব সুখচিন্তায় অমর বিহ্বল হইয়া পড়িত।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির যদি সীমা না থাকিত, দূরত্বের ব্যবধান গৃহবৃক্ষাদির অন্তরাল ও আলোকের প্রভাব যদি তাহাকে বাধা না দিত, তাহা হইলে অমর দেখিতে পাইত, সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া লতিকা তাহারই কথা ভাবিতেছে আর মনে করিতেছে—অমর কি ট্রেণে বসিয়া এমনি করিয়া তাহাকেও স্মরণ করিতেছে।

*

*　　*

মাসকয়েক দুঃখ ও পরিশ্রমের মধ্যে বড় সুখে কাটিল। কিন্তু যেমন আতিশয্য, তেমনি অভাবের মধ্যে বুঝি প্রেমের অভিশাপ লুকানো থাকে—তাহাই আবার ধীরে-ধীরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি মনোহর বলিল—ক'দিন পরে লতুকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবো।

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

মনোহর বলিল—লতুকে এবার ম্যাট্রিকটা দেওয়াবো ভাবছি। ক'দিন পরেই পরীক্ষা।

সুহাসিনীর রাগ হইল যে, ভিতরে-ভিতরে এত-সব ব্যবস্থা হইয়াছে, অথচ তাহাকে একবার বলাও দরকার বলিয়া মনে হয় নাই। বলিল—তা, মেয়ে পাশ ক'রে কি করবে! পয়সা আনবে?

মনোহর বলিল—তা যদি আনে, তাতে ক্ষতি কি?

সুহাসিনী। মেয়ে তো চাকরি করবে! বিয়ে দিতে হবে না তো?

মনোহর। বিয়ে দিতে হবে না তা বলছিনি। তবে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েও বিয়ে দেওয়া যায়। আর ধরো, যদি

সময়মত বিয়ে দিতে না পারি, বা, তার আগে হঠাৎ মারা যাই, সে-সময়ে লতু যদি চাকরিই করে, তা'হলে তো দুঃসময়ে সাহায্যই হবে।

সুহাসিনী এ-কথা শুনিয়া যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—থাক্, এত দরদ দেখাতে হবে না। বলে, উনি আমার দুঃখ দূর করলেন বড়, তার মেয়ে পাশ ক'রে দুঃখ দূর করবে··· পোড়া কপাল!

মনোহর বলিল—তুমি কেন এতে এত রাগ করছো বুঝতে পারি না। আমি কিছু মন্দ ভেবে এ-কথা বলিনি।

সুহাসিনী। না, তোমার খুব দয়ার শরীর, তাই খুব ভালো ভেবে এ-কথা বলেছো। তবে, আমার ভালোর জন্যে দয়া ক'রে তুমি অত ভেবো না···আমার অত ভালোর দরকার নেই।

বলিয়া উদ্গত-অশ্রু গোপন করিবার জন্য সুহাসিনী সে-স্থান ত্যাগ করিল।

যথাসময়ে পরীক্ষা আসিল। লতিকাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মনোহর পরীক্ষা দেওয়াইয়া আনিল।

সংসার যেমন চলিতে থাকে তেমনই চলিতে লাগিল। সুহাসিনী—মেয়ের লেখাপড়া করা, পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধেও একটি কথা উচ্চারণ করিল না। মাসকয়েক পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গেল যে, লতিকা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

লতিকা মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—মা, আজ পাশের খবর এলো, আজও কি মা তুমি রাগ ভুলে গিয়ে একটি আশীর্ব্বাদ করবে না ?

সুহাসিনী একবার কি ভাবিল। তারপর লতিকার মাথায় হাত দিয়া মনে-মনে আশীর্ব্বাদ করিল ও তাহাকে উঠাইয়া বুকের কাছে ক্ষণকাল রাখিয়া বলিল—রাগ কেন মা, আশীর্ব্বাদ করছি, তোরা সবাই সর্ব্ব-সুখে সুখী হবি।

সঙ্গে-সঙ্গে লতিকার শিরে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কোথায় যে সুহাসিনীর রাগ, সে-কথা তো মেয়ে বোঝে না, মেয়েকে সে-কথা বুঝাইয়া বলাও যায় না।

সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইয়াছিল—মনোহরের। মনোহর মনোমধ্যে কয়েকটি বাসনা সংগোপন রাখিয়াছিল। তার মধ্যে একটি হইতেছে, মেয়েদের শিক্ষিতা করিয়া যাওয়া। তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শিক্ষার সোপানে উঠিয়াছে, ইহাই তাহার আনন্দের কারণ।

রাত্রে মনোহর অন্য দিন অপেক্ষা একটু প্রফুল্লভাবে এবং অন্য দিনের চেয়ে একটু আগে গৃহে ফিরিল। সুহাসিনীকে বলিল—দেখ, অত বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ ক'রো না, ওতে শরীর টিক্‌বে না।

সুহাসিনী বলিল—তোমার নিজের বেলায় সে-কথা মনে থাকে না কেন ?

মনোহর বলিল—তোমাকে সব কথা আমি বুঝিয়ে বলতে

পারছি না, তাই তুমি ভাবছো আমি অন্যায় ক'রে বেশী খাটছি! একদিন সময় এলে বুঝবে, আমি একটুও অন্যায় করছি না। একদিন ছিল যখন আমার কথা তুমি বিনা-তর্কে মেনে নিতে, আজকের এ-কথাটিও যদি সেইভাবে মেনে নাও আমি সেটা অনুগ্রহ ব'লে মানবো।

সুহাসিনী ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিল—যাক্, আর 'অনুগ্রহ' ইত্যাদি ব'লে বিগ্রহ ক'রো না। জানোই তো আমি তোমার মত শিক্ষা পাইনি!

ইহার পর আর কোনো কথা হইল না। কিন্তু, তর্ক করিলেও সুহাসিনী অন্য দিনের চেয়ে শীঘ্র করিয়া কাজ সারিয়া শয়নকক্ষে আসিল।

মনোহরের শীর্ণ মুখে আজ প্রসন্নতা ফুটিয়াছে। সুহাসিনীকে কাজ সারিয়া আসিতে দেখিয়া মনোহর বলিল —এত ব'লে-ক'য়েও যে আজ একটু শীগ্‌গির ক'রে এসেছো সেও ভালো। তর্ক করা তোমার একটা স্বভাব।

সুহাসিনী শয্যার উপর উঠিয়া বলিল—তা তো বটেই। তুমিই তো আমাকে এইরকম করেছো—চিরদিন কি আমি এমনি ছিলাম?

মনোহর বলিল—দেখ, আজ আর ঝগড়া কোরো না। দুটো কথা আমাকে শান্ত হয়ে বলতে দাও। তুমিও ঠাণ্ডা হয়ে শোনো।

সুহাসিনী চুপ করিল। শুনিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিল।

মনোহর বলিল—দেখ, দুটি আশার বশবর্ত্তী হয়ে আমি লতুকে ম্যাট্রিক পাশ করাবার চেষ্টা করেছি। প্রথম যৌতুক তো তেমন দেবার ক্ষমতা হবে না···যদি মেয়েকে কিছু শিক্ষা দিলে, সস্তায় ও সহজে ভালো পাত্র পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় যদি ভালো বিয়ে দিতে না পারি, শ্বশুরবাড়ীতে কোনোরকম আশ্রয় না পায়, মেয়ে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে সৎপথে থেকে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করতে পারবে। একটা উদ্দেশ্য আমার কিছু সফল হয়েছে, আর-একটা হচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্যে কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা। তুমি কিছু মনে কোরো না—সেটা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বক্ষণ আজকাল এই চিন্তা আমার মনে জাগে—যদি আজ আমার ডাক পড়ে, কাল সকলের কি উপায় হবে। যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন এই চিন্তা দ্বিগুণ হয়। আমি আজকাল যে বেশী খাটছি তার উদ্দেশ্য এই। সকালে ও রাত্রে খেটে আমি যে, দশ টাকার বেশী উপায় করি না তা নয়। যে টাকাটা বেশী রোজগার করছি, সে-টাকাটা ভবিষ্যতের জন্যে রাখছি। এর জন্যে তুমি কিছু মনে করো না। এ-কথাও যেন ভেবো না যে, তোমার হাতে দিলে তুমি খরচ ক'রে ফেলবে, বা, নিজে রাখবে এই ভেবে তোমাকে দিচ্ছি না। সংসারে আরও বেশী খরচের দরকার। কিন্তু তাহ'লে দুর্দ্দিনের উপায় তো কিছু হবে না!

সুহাসিনী সব বুঝিল। তাহার মনে যে অভিমানের ব্যথা সর্ব্বক্ষণ পীড়া দিত, তাহা ইহাতে অনেকখানি কমিয়া গেল।

সে-স্থানে বরং স্বামীর প্রতি কর্কশ ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা জাগিতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিল—তুমি আমার জন্যে, আমার ভবিষ্যতের জন্যে এই-সব করছো, এ-কথা আমাকে বোলো না। ও-কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

সুহাসিনীর কোথায় ব্যথা বুঝিয়া মনোহর ধীরে-ধীরে সান্ত্বনার স্বরে বলিল—শুধু তোমার জন্যে এ-ব্যবস্থা এ-কথা কেন ভাবছো! ভবিষ্যতের কথা কেউ বলতে পারে না। ধরো, এমনই যদি হয় যে, আমাদের দু'জনকেই যেতে হ'লো, তখন কে ছেলেমেয়েদের দেখবে? তারা যে একেবারে অপার সমুদ্রে পড়বে!

সুহাসিনী বলিল—অত ভাবলে কি চলে? ও-সব ভগবানের ইচ্ছা! তাঁর ইচ্ছার উপর কিছু-কিছু ছেড়ে দিতে হয় বৈকি।

মনোহর বলিল—তা হয় জানি, কিন্তু ভগবান্ যে এই-জন্যেই মানুষকে শক্তি দিয়েছেন। শক্তির প্রয়োগ না করলে যে তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে হবে—এ কথাও তো ভুল্‌লে চল্‌বে না! তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করো, আমি যা বল্‌চি সত্যি কি না? যদি মন তোমার এ-কথায় সাড়া দেয়, তাহ'লে মুখকে তর্ক করতে শিখিও না। তবে, এটাও তোমাকে জানিয়ে রাখছি, যা সামান্য-কিছু বাঁচাতে পারছি তা আমি নিজের কাছে রাখছি না—নিজের সঞ্চয়ের শক্তির উপর আমার বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর মনের মধ্যে যেটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি

দিয়েছেন তারই বশে কাজ করছি…তোমাকে অবিশ্বাস করছি না—নিজেও অপব্যয় করছি না।

সে-রাত্রে সুহাসিনীর অনেক দুঃখ কমিয়া গেল। আনন্দ ও সুখ যেন দু'জনেরই মনের বাতায়ন দিয়া সারারাত্রি নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। যৌবনে সে আনন্দ না পাইলেও, যৌবনান্তে ভুলক্রমে অনেকেই যাহা পাইয়াছে বলিয়া মনে করে, বুঝি আজ এতদিন পরে দু'জনেই স্বপ্নে সেই অজ্ঞাত-আনন্দের আস্বাদ পাইল।

*

*   *
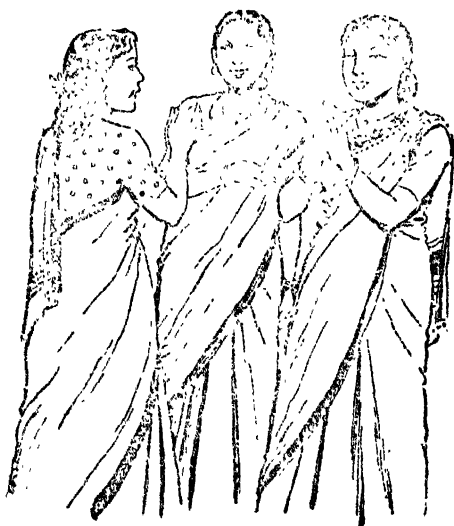
অমর এই সময়ে কয়েকদিনের জন্য বাগীশদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। গ্রীষ্মের ছুটির সময় সে কিছুদিন অমর-দের বাড়ী থাকিয়া যাইবার পর অমরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বাগীশ, অমরের সতীর্থ ও বন্ধু। বাড়ী—বিরাজপুর। বাগীশ নামটির একটা ইতিহাস আছে। কলেজে বার্কের Impeachment of Warren Hastings হইতে কয়েক স্থান এমন সুন্দরভাবে সে আবৃত্তি করিয়াছিল যে, সেই সময় হইতে সে 'বার্ক' আখ্যা লাভ করে। সেই বার্ক হইতে এই বাগীশ নামের উৎপত্তি এবং এই নামেই সে বাহিরে সকলের কাছে পরিচিত।

বিরাজপুরে থাকিতেই সে কাগজে লতিকার পাশের সংবাদ পাইল এবং সেইদিনই বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেন যে সে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথাটাও বাগীশকে বলিতে হইল। বাগীশ শুনিয়া বলিল—ভাবে বোধহয় তুমি লতিকার প্রেমে পড়েছো। কিন্তু এ-প্রেম নিষিদ্ধ নয় তো ?

অমর বলিল—কি যে বলো তুমি তার ঠিক নেই। তুমি নিতান্তই বাগীশ।

অতঃপর বাগীশ তাহাকে অনিচ্ছায় যাইতে দিল।

অপরাহ্ণে বাড়ী পৌঁছিয়া, অমর সন্ধ্যায় লতিকাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

মনোহর তখন বাহিরে। সুহাসিনী তাহাকে বসিতে বলিয়া দুই-একটি কুশল প্রশ্ন করিয়া, সংসারের কাজে চলিয়া গেল। অমর ঘরে আসিয়া বসিল। কথিকা, যূথিকা, রামপ্রসাদ কিছুক্ষণের জন্য অমরকে ঘিরিয়া রহিল। সর্ব্বশেষে লতিকা খোকাকে কোলে করিয়া আসিল। একটু পরে কথিকা মায়ের সাহায্যের জন্য উঠিয়া গেল·· যূথিকাও তাহার অনুসরণ করিল··· রামু পড়িতে গেল।

অমর বলিল—দেখ লতু, আমি বলেছিলাম না যে, তুমি নিশ্চয়ই ভালো ক'রে পাশ করবে?

লতিকা বলিল—একে আর ভালো ক'রে পাশ করা বলে না আজকাল। ফার্ষ্ট-ডিভিশনে পাশ করা আজকাল অতি সাধারণ।

অমর। তা হোক। আমার বিশ্বাস, তুমি যদি কোনো স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে, তাহ'লে নিশ্চয়ই বৃত্তি পেতে। প্রাইভেটে দিলে সে সুযোগ নেই।

লতিকা। বৃত্তি না পাই, আমি যে পাশ ক'রে, বাবাকে

একটু সুখী করতে পেরেছি, এতেই আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি।

অমর। সে-কথা ঠিক। স্যার এই খাটুনির মধ্যেও যে তোমাকে এইভাবে পড়াতে পেরেছেন এ তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।

লতিকা। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছে—ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে, তবু তিনি বিশ্রাম নেন্‌নি। কিন্তু আমি পাশ ক'রে বাবার কোনো দুঃখ দূর করতে পারবো না, এই আমার দুঃখ। আমি যদি মেয়ে না হয়ে, ছেলে হতাম, তাহ'লে বাবার অনেক দুঃখ কমতো।

অমর। মেয়ে হয়েও তুমি স্যারকে সুখী করতে পারবে। চেষ্টা করলে কি না হয়?

লতিকা। কিন্তু, আমি তো কোনো পথ দেখতে পাচ্ছি না। বাবার দুশ্চিন্তার সীমা নেই, দুঃখের শেষ নেই। তবু তিনি সমস্ত দুঃখ মুখ বুজে সহ্য করছেন। আমি সব দেখছি, সব বুঝছি—অথচ কিছুই করতে পারছি না, বরং দিন-দিন তাঁর দুশ্চিন্তা বাড়িয়েই তুলছি।

শেষের কথাটা বলিয়া লতিকা মুখ নত করিল। অমর লতিকার লজ্জিত মুখভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল—লতু, তুমি মিথ্যে ক্ষোভ কোরো না…মিথ্যে লজ্জা পরিত্যাগ করো। বরং, যাতে তুমি সংসারের সাহায্য করতে পারো তারই চেষ্টা করো।

লতিকা মুখ তুলিয়া ধীরে-ধীরে বলিল—কি ক'রে করবো, ব'লে দাও অমর-দা! তুমি ছাড়া ভরসা দেবার কেউ নেই আমাদের।

অমর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—আমি আর কি করতে পারছি লতু! স্যারের কাছে অমূল্য জিনিষ পেয়েছি, তার জন্যে চিরজন্ম যদি তাঁর সেবা করি, তাহ'লেও বেশী-কিছু করা হয় না। তাঁর কাছে যে শুধু জ্ঞান, বা, শিক্ষা পেয়েছি তা নয়। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্নেহও পেয়েছি। সে-স্নেহ যে কি, তা তো তুমি খুব জানো!

লতিকা কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে অমরের পানে চাহিয়া বলিল—তুমিই তাহ'লে ব'লে দাও, কি-ক'রে আমি বাবার অন্তত কিছু দুঃখ লাঘব করতে পারি।

অমর বলিল—তাঁর দুঃখ বা দুশ্চিন্তা সবই তো তোমাদের জন্যে লতু! তোমরা যদি স্বাবলম্বন শিখতে পারো, ভালো ক'রে শিক্ষা লাভ করতে পারো, তাহ'লে তাঁর দুর্ভাবনাও সেই পরিমাণে অনেকটা কমে যাবে।

লতিকা। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে মেয়েমানুষে কি করবে বলো। যদি ছেলে হতাম তবু একটা পনেরো-কুড়ি টাকার চাকরি করেও বাবার একটু সাহায্য করতে পারতাম।

অমর। তুমি উতলা হোয়ো না। এই অবস্থাতেই তুমি যে সাহায্য করতে পারো, আমি সেই কথাই তোমাকে বলছি। আই. এ.-র বই সবই আমার কাছে আছে। দু'একখানা মাত্র

বদ্‌লেছে। সেগুলো সব ধীরে-ধীরে পড়তে থাকো; বাকিগুলোও আমি সব এনে দেব। কিছু বাইরের বইও পড়া দরকার; সে-বইও আমি যোগাড় ক'রে দেব। ঠিক দু'বছর পরে আই. এ. দেওয়া চাই। তোমার Substance (সারাংশ) লেখবার বেশ হাত আছে। ও-অভ্যাসটা রাখবে।

লতিকা। তা যেন করলাম। কিন্তু মায়ের যে আর বেশী-পড়ায় আপত্তি।

অমর। কেন? কাকীমা কি বলেন?

লতিকা। মা বলেন, আর পড়লে লাভ তো নেই-ই, বরং অ-লাভ আছে।

অমর। কাকীমা এ-কথা বলেন কেন?

লতিকা। মা বলেন, আমাদের গৃহস্থের সংসারে এইটুকু শিখেই বিপদ···এর চেয়ে বেশী শিখলে—

বলিয়া লতিকা লজ্জায় চুপ করিল।

অমর। এ তোমার সেই 'দুর্ভাবনার' কথা। তা, আমাদের সমাজ-হিসাবে কথাটা ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু, কেন এমন হয় আমি তাই ভাবি। শিক্ষা যদি গুণ হয়, তাহ'লে গুণবতী মেয়েদের আদর কেন বাড়ে না আমি তা বুঝতে পারি না।

লতিকা। মা বলেন, শিক্ষা মানে তো কেবল পাশ করা, বা, ইংরেজী শেখা নয়; শিক্ষা মানে, সকল বিষয়ের জ্ঞান। গৃহস্থঘরের মেয়ে···সংসারের সব শিখতে হবে···শুধু বইয়ের বিদ্যা শিখলে হবে না।

অমর। এ ঠিক কথা। কিন্তু তুমি তো সংসারের সব শিক্ষা পেয়েছো।

লতিকা। মা বলেন, সে-কথা তো বাইরের লোকে জানবে না। তারা ভাবতে পারে, মেয়ে হয়তো ইংরেজী বই দু'খানা প'ড়ে একেবারে বিবি হয়ে গেছে। আর, যাঁরা এ-কথা ভাবেন না, তাঁদের কাছে বাবা এগুতে পারবেন না।

অমর। কারো কাছে যদি এগুতে না হয় লতু ?

লতিকা একবার অমরের পানে মুখ তুলিয়া চাহিল ; তারপর আনন্দে ও লজ্জায় মাথা নীচু করিল।

অমর আবার বলিল—কেউ যদি নিজে সেধে আসে লতু, তাহ'লে কি তার কথা রাখবে ?

লতিকার সর্ব্বদেহ আনন্দের আবেশে কাঁপিতেছিল। অমরের ভয় হইল পাছে লতিকা পড়িয়া যায়। সে ব্যস্ত হইয়া লতিকার একখানি হাত, হাতের মধ্যে লইয়া চুপি-চুপি বলিল—শান্ত হও লতু। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। তোমায় কিছু বলতে হবে না।

লতিকা ধীরে-ধীরে শান্ত হইল, কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা—কণ্ঠের মধ্যে ও অমরের কথার যে-সুর তাহার কাণে বাজিতেছিল সেই সুরের মধ্যে হারাইয়া গেল !

---

*

*   *

মনোহর যখন নরহরির দোকানে খাতাপত্র লিখিয়া ফিরিয়া আসিল তখন অমর বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। আজ অমর ও লতিকার মুখ যেন আনন্দে উল্লাসিত বলিয়া মনে হইল। লতিকার পরীক্ষা-সাফল্যের জন্য তাঁহার মনেও কম আনন্দ হয় নাই। কিন্তু ইহাদের আজিকার আনন্দ যেন অন্যরকম। ইহার মুল যেন আরও দূরে—হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে।

মনোহরের আজ হঠাৎ মনে হইল, ইহাদের দুটিতে যদি বিবাহ হয় তো কি সুখের হয়! দু-জনেই দু-জনের সর্ববতো-ভাবে উপযুক্ত।

অমর জিজ্ঞাসা করিল—স্যার! আপনার বইয়ের আর কত দেরী?

মনোহর বলিল—Historyর Note তো শেষ হয়েছে। কিন্তু Text-book এখনও বাকি আছে খানিকটা। ভাবছি, এখানা শেষ হ'লে একসঙ্গে দু'খানাই তোমার হাতে দেব।

অমর বলিল—Note যে-কোনো সাধু প্রকাশককে দিয়ে ছাপানো যেতে পারে, কিন্তু Text-book প্রকাশ করতে গেলে, নামজাদা প্রকাশক চাই। আমি দু-এক দিনের মধ্যে একবার কলকাতা যাবো, আপনার নোটখানি আমাকে দিন। এবারেই

চেষ্টা ক'রে আস্‌বো। কিন্তু Text-book খানিও শীগ্‌গির শেষ করে ফেলুন। ওখানা আবার টাইপ করিয়ে তবে দিতে হবে। নামজাদা প্রকাশকেরা আবার হাতের লেখা পছন্দ করেন না।

মনোহর বলিল—তাই দেব। সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই শেষ হবে মনে হয়। নোটখানা তাহ'লে এখনি নিয়ে যাবে ?

অমর বলিল—তাই দিন।

মনোহর লতিকাকে বলিল—মা, সেই নোটখানা অমরের হাতে দাও তো !

লতিকা পিতার ঘর হইতে পাণ্ডুলিপিখানি আনিয়া অমরের হাতে দিল।

অমর পাণ্ডুলিপি হাতে করিয়া, লতিকার হাতের মধুর স্পর্শটুকু ভাবিতে ভাবিতে গৃহের দিকে যাত্রা করিল।

মনোহর বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল—এরা দু'জনই দু-জনের যোগ্য···প্রতিবন্ধক একমাত্র তাঁহার দারিদ্র্য। কিন্তু অমরের পিতা সদাশয় লোক। তিনিও কি সাধারণ লোকের মত কন্যার পিতার দারিদ্র্যকে একটা প্রতিবন্ধক মনে করিবেন ? হয়তো করিবেন না। অবশ্য, নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি ? যদি রাজী হন্ তো, সব দিক দিয়াই ভালো। লতিকার ভালো বিবাহ হইবে, সঙ্গে-সঙ্গে তাহার অবর্ত্তমানে ছেলে-মেয়েদের একজন অভিভাবকও হইবে। মানুষের জীবন

সত্যসত্যই পদ্মপত্রের জল। কখন যে শেষ হইবে বলা যায় না। এক-এক সময়ে মনে হয়, বুঝি আর বেশী দেরী নাই। ইদানীং বুকে এক-এক সময়ে একটা বেদনা বোধ হয়, কিন্তু কাহাকেও সে-কথা বলে নাই। ডাক্তারকেও দেখায় নাই। শুধু আপনাআপনি মনে হয়, ইহা একটি কঠিন রোগের সূচনা। ভবিষ্যতের জন্য সামান্য একটা ব্যবস্থা করিয়াছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ যেরূপ দীর্ঘ এবং ব্যবস্থা যেরূপ সামান্য, তাহাতে তাহার অবর্ত্তমানে সংসারের কতটুকু অভাব দূর হইবে! যদি অমরের পিতা রাজী হন তো সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

মনোহর রাত্রে আহারাদির পর সুহাসিনীর কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিল।

সুহাসিনী বলিল—এ-কথা তোমার আজ মনে হয়েছে, কিন্তু আমি বহুকাল আগে এ-কথা ভেবেছি। শুধু তুমি কি ভাববে ভেবে তোমাকে বলিনি।

মনোহর বলিল—কাল তো রবিবার, অমরের বাবা বাড়ী থাকবেন। কথাটা কি কালই পেড়ে দেখবো?

সুহাসিনী পরামর্শ দিল যে, দেখাই উচিত।

এ-বিবাহ হইলে যে কত ভালো হয়, সে-সম্বন্ধেও দু-জনে কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিটা কোনোরকমে কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে উঠিয়া মনে-মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনোহর অমরদের বাড়ীর উদ্দেশে চলিল।

রবিবার ছেলেদের ছুটি। গৃহশিক্ষকদেরও তাই। সমর তাই মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। মনোহর হাসিয়া বলিল—ভয় নেই, তোমায় আজ পড়তে হবে না। আজ তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সমর ছুটিয়া পিতাকে খবর দিতে গেল। একটু পরেই চন্দ্রনাথবাবু নামিয়া আসিলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর চন্দ্রনাথবাবু সমরের লেখাপড়া সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সমর নিজের সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা শুনিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর মনোহর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আমি একটা বিষয়ের জন্যে ভিক্ষার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

চন্দ্রনাথবাবু একটু জিজ্ঞাসুভাবে চাহিয়া বলিলেন—কি কথা, আজ্ঞা করুন!

মনোহর বলিল—আমার বড় মেয়ে লতিকা এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, শুনেছেন বোধহয়?

চন্দ্রনাথবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি! বেশ ভালো কাজ করেছেন আপনি। আমার স্ত্রী বলছিলেন, এত কাজের মধ্যেও যে আপনি সময় ক'রে মেয়েটিকে পড়াতে পেরেছেন এ আপনার পক্ষে অতি প্রশংসার বিষয়। অমর তো বলে, লতিকা যা শিখেছে তাতে সে একটু চেষ্টাতেই আই. এ. পাশ করতে পারে।

মনোহর বলিল—আপনার আশীর্ব্বাদ। লতু গৃহকর্ম্ম সব জানে। বড় শান্ত আর মন বড় উঁচু। এরই জন্যে আজ ভিক্ষায় এসেছি। অমর তো বিবাহ-যোগ্য হয়েছে। মেয়েটিকে যদি দয়া ক'রে অমরের জন্যে গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথবাবুকে চিন্তিতমুখে নীরব থাকিতে দেখিয়া মনোহর বলিল—আপনার অবস্থার সঙ্গে আমার আকাশ-পাতাল পার্থক্য আমি জানি। কিন্তু আপনি দরিদ্রকেও ঘৃণা করেন না—সেই ভরসায় আমি আপনার কাছে এই প্রস্তাব করতে সাহসী হয়েছি।

চন্দ্রনাথবাবু বলিলেন—আপনার প্রস্তাবে কোনো দোষ হয়নি। লতিকার কথা আমি সব শুনেছি। অমন মেয়ে পুত্রবধূরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তারপর, আপনার উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আপনার বংশ নির্ম্মল তাও আমি জানি। কিন্তু এর একটা প্রতিবন্ধক আছে। আমাদের যে বংশমর্য্যাদা, তার উপর আমার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। পাল্‌টা-ঘর ভিন্ন আমরা আজ পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ের বিবাহ দিইনি। সেইজন্যে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কৌলিন্য ভঙ্গ হয়নি। আপনারা ভঙ্গ, আপনাদের বংশে বিবাহাদি হলেই আমাদেরও ভঙ্গ হতে হবে···নৈকষ্যের মর্য্যাদা চলে যাবে। অবশ্য, এর যে একটা খুব বেশী দাম আছে, তা নয়। কিন্তু, তবু এর মায়া আমি ছাড়তে পারি না। আমার বাবা পর্য্যন্ত এই কৌলীন্যকে অব্যাহত রেখে গেছেন, আমিও তাই রেখে যেতে চাই। আমা হতে

যে এর দ্বারা বাধা পাবে, এ-কথা মনে করতেই আমার অন্তরে ব্যথা লাগে। এ একটা বহুকালকার বদ্ধমূল সংস্কার ছাড়া বেশী-কিছু নয়। তবে আপনি তো জানেন, সংস্কারের শক্তি কত বিশাল!

বলিয়া চন্দ্রনাথবাবু সত্য-সত্যই হাত জোড় করিলেন।

আশাভঙ্গের গভীর ব্যথা মনোহরের মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিল। মনোহর বলিল—এতটা ঠিক আমি বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, মেয়ের বিবাহ দিতেই আপনাদের সমান ঘরের প্রয়োজন। আমায় ক্ষমা করবেন।

মনোহর উঠিয়া হাত-জোড় করিয়া বলিল—আপনি এ-কথা বলবেন না। আমি আপনার কথা সব বুঝেছি। এর জন্যে আপনার দোষ দিতে পারি না। অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের সব আশা সব সময়ে পূর্ণ হয় না। এ-ব্যাপারও তারই একটা প্রমাণ। আমি না বুঝে আপনার উদার মনে কষ্ট দিয়েছি, সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।

চন্দ্রনাথবাবু সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—লতিকার বিবাহে আমার দ্বারা আর যা সহায়তা সম্ভব হয় আমি তা সানন্দে করবো। আমি আজ হ'তে যোগ্য পাত্রের সন্ধানও করতে থাকবো এবং সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাবো।

—আমি তবে এখন আসি। আপনার দয়া আমি কখনো ভুলবো না। বলিয়া মনোহর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইল। মনোভঙ্গের যে ব্যথাটুকু তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল

তাহাতে চন্দ্রনাথবাবুকে কাতর করিয়াছিল। কাহাকেও নিরাশ করা তাঁহার স্বভাব নহে। আজ কিন্তু তাঁহাকে স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করিতে হইয়াছে, তাই তিনি ক্লিষ্ট ও চিন্তান্বিত মুখে ধীরে-ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মনোহরের কাতর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক মুখমণ্ডল সত্যই তাঁহার উদার ও দয়াশীল হৃদয়কে পীড়া দিতেছিল।

*

* *

স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়াও সুহাসিনী বুঝিয়াছিল যে, স্বামীর চেষ্টা সফল হয় নাই। তথাপি জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিতেই মনোহর বলিল—কিছুই হলো না।

সুহাসিনী বলিল—রাজী হ'লেন না? কি বললেন?

মনোহর হতাশার সহিত বলিল—তাঁরা নৈকষ্য কুলীন, ভঙ্গের সঙ্গে কাজ করতে অনিচ্ছুক।

সুহাসিনীর মুখভাব একটু কঠিন হইয়া উঠিল। বলিল—সত্যিই কি এই আপত্তি, না, ভেতরে টাকার খাঁই আছে?

মনোহর বলিল—না, তা নেই। তিনি যে-সব কথা বললেন, তা আন্তরিক ভাবেই বললেন। লতুর বিবাহে আর যা সহায়তা দরকার হয় তা তিনি আনন্দের সঙ্গে করবেন—এ-সব কথাও বললেন।

সুহাসিনা অবসন্নমুখে বলিল—তবে তো খুবই করেছেন! ও-সব ছেঁদো-কথা···বড়মানুষি ঢং ক'রে বলা। যে উপায় তাঁর হাতের মধ্যে সে উপায়ে সাহায্য করতে পারবেন না, আর, অন্য উপায়ে সাহায্য করবার জন্যে একেবারে অস্থির। তুমি যেমন তাই ওই কথায় ভুলে এলে।

মনোহর উদাসভাবে বলিল—ভুলে না এসে আর কি করতে পারতাম, বলো? …আপনাকে বিয়ে দিতেই হবে, নইলে ছাড়বো না—একথা ব'লেও তো কোনো লাভ নেই।

সুহাসিনী তিক্ততার সহিত বলিল—তা নেই জানি! কিন্তু মাখামাখিরও তো কম নেই তাব'লে!

মনোহর একটু বিরক্তির সহিত বলিল—মাখামাখি থাকলেই যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে, এমন কোনো বাঁধাবাঁধি তো নেই! মাখামাখি করি নিজের গরজে। তোমাদের জন্যেই এ-সব করতে হয়।

সুহাসিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—তোমাদের জন্যে, তোমাদের জন্যে, বারবার এ-কথা বলো কেন? ছেলেপুলের জন্যে করো তাই বলো। ছেলেপুলে—আমারও যেমন, তোমারও তেমনি।

মনোহরের শরীর ও মন তখন নিরাশার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ক্লান্তকণ্ঠে কহিল—আচ্ছা, স্বীকার করছি 'তোমাদের' বলা অন্যায় হয়েছে। আজ থেকে 'তোমাদের' না ব'লে, 'আমার' বলবো। আমি যে রোজ সকালে ছেলে-পড়ানো থেকে সন্ধ্যায় দোকানদারের খাতাপত্র লেখা পর্য্যন্ত সব নিজের জন্যে করি—এই কথাটাই বলবো আর ভাববো।

সুহাসিনী বলিল—তুমি দোকানে খাতা লেখো কি ওজন করো সে-কথা আমাকে শোনানোর কি দরকার! আমি পরনের

দু'খানা কাপড় আর পেটের দুমুঠো ভাত ছাড়া কখন কিছু চাইনি—পাইওনি। তা আমাকে ও-কথা বলা কেন? নিজের দরকার বুঝেছো—করেছো; দরকার বুঝতে না—করতে না।

মনোহর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নিজের দরকার কি কার দরকার, যেদিন জানবে, সেদিন বুঝবে।

—আমি জানতেও চাই না, বুঝতেও চাই না। চিরকাল যা ক'রে এসেছি, আজও তাই করছি।

বলিয়া সুহাসিনী রাগ করিয়া সেখান হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মনোহর ভাবিতে বসিল। ভাবনার আর শেষ নাই। অন্যদিন স্কুল থাকে, ছেলে-পড়ানো থাকে, সময় একরকমে কাটিয়া যায়। আজ কিন্তু চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই সম্বল নাই। কোনোদিকে সহানুভূতির কোনো প্রত্যাশা নাই। কন্যার বিবাহের যৌতুক দিবার ক্ষমতা নাই···সমাজের যে অবস্থা, তাহাতে পাত্রাপাত্রের বিচার নাই···পুরুষ হইলেই সে পাত্র। সুতরাং তাহাদের ইচ্ছামত যৌতুকাদি দিতেই হইবে। না দিলে বিবাহের উপায় নাই। যে দুর্ব্বল-সমাজে তাহার বাস, তাহাতে এ-অবস্থাতেই কন্যার বিবাহ না দেওয়া একটা প্রকাণ্ড অপরাধ—এবং হয়তো বিপদের কথাও বটে। লতিকাকে যদি আর-একটু লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে, হয়তো বিবাহ না করিয়াও তাহার জীবিকা সে অর্জ্জন

করিতে পারিবে। কিন্তু, তাহার ফলে হয়তো কণিকা আর যূথিকার বিবাহ হওয়া দুর্ঘট হইবে।

তাহা ছাড়া, গরীবের তাসের ঘরে বাস। যখন এতটুকু বাতাসে ঘর ভাঙিয়া যায়, তখন স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের কি হইবে? কাহার আশ্রয়ে তাহারা যাইবে? কে তাহাদের দেখিবে? তাহার দারিদ্র্য ও অবিবেচনার জন্য কি, স্ত্রী-পুত্রকন্যা তাহাকে অভিসম্পাত দিবে না? এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করিয়া, এত অভাব সহ্য করিয়া, এত অশান্তির তুফান তুলিয়া ভবিষ্যতের জন্য যেটুকু ব্যবস্থা করিয়াছে সে, তাহার মূল্যই-বা কতটুকু?

ইতিহাসের বইখানি এখনও শেষ হয় নাই। আর বিলম্ব করা উচিত নহে। আর কাহারও কাছে কোনো প্রত্যাশা না করিয়া, নিজের শক্তিতে, নিজের সামর্থ্যে যাহা হয় তাহাই আজ হইতে সে সম্বল করিবে। সে, সমরের গৃহশিক্ষক; ঠিক সেই হিসাবেই সেখানে যাইবে। মাসিক কয়টি টাকা মাত্র তাহার প্রাপ্য। তাহার বেশী কিছু তাহার চাহিবার নাই—এই শিক্ষাটুকু সর্ব্বক্ষণ তাহাকে মনে রাখিতে হইবে। আর, গৃহে স্ত্রীর কাছেও কিছু প্রত্যাশা করিবে না। পুত্র-কন্যাদের কাছেও নয়। কাহারও কাছে প্রত্যাশা না রাখিলে, নিরাশার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। দুঃখ কোনো-প্রকারে সহ্য হইয়া যায়, কিন্তু নিরাশার আঘাত বড় দুঃসহ।

সেদিন মনোহর নামমাত্র আহারে বসিল। যাহা পারিল দুই মুঠা মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িল। এইবার স্থির করিল, আর এক মুহূর্ত্ত সময় অপব্যয় করিবে না। তাহার পর লেখা লইয়া বসিল।

ছত্রের পর ছত্র লিখিয়া চলিল। যে বেদনা তাহার অন্তরে দারুণ দুঃখ দিতেছিল, আজ তাহাই তাহার লেখাকে সহজ, সুন্দর ও সরল করিয়া তুলিতে লাগিল। যে ইতিহাসকে মনোহর চিরদিন খণ্ড-বিখণ্ড ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে না করিয়া, সমাজের ও দেশের ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ—কত-শত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনাদির অন্তর্নিহিত নীতিগর্ভ বিরাট্ সত্যের মনোজ্ঞ-কাহিনী বলিয়া মনে জানিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকরূপে তাহার মনোমাঝে উদিত হইয়া মধুর ভাষার বন্ধনে ধরা দিতে লাগিল।

দিন শেষ হইয়া গেল। তবু লেখার বিরাম নাই। দীপ জ্বলিল, প্রাঙ্গণে শঙ্খধ্বনি উঠিল। আকাশে একে-একে উজ্জ্বল তারাগুলি ফুটিতে লাগিল, তথাপি মনোহর একটি বারের জন্যও লেখা হইতে বিরত হইল না। এক-একবার বড় ক্লান্তি আসিলে সে ক্ষণকালের জন্য উঠিয়া কক্ষের মধ্যেই পদচারণা করিয়া লইল …আবার একটু পরে লিখিতে বসিল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। লতিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, খাবার দেওয়া হবে?

মনোহর বলিল—আমার খাবারটা এই ঘরেই ঢেকে রেখে, তোমরা খেয়ে নাওগে। আমার খেতে আজ অনেক রাত হবে।

লতিকা তথাপি একবার বলিল—ওবেলা তো একেবারেই খাওয়া হয়নি ; খেয়ে নিয়ে লেখো না কেন, বাবা!

মনোহর মুখ তুলিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না মা, তা'হলে লেখা হবে না। তোমরা আমার খাবার এখানে রেখে, খেয়ে নাওগে।

লতিকা আর কিছু বলিতে পারিল না। নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পিতার রাত্রিকার খাবার আনিয়া, সযত্নে তাহা ঢাকিয়া রাখিয়া, ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল।

আর সব ছেলেমেয়েরা আগেই খাইয়া লইয়াছিল। লতিকাকেও মায়ের তাড়নায় খাইতে বসিতে হইল। সে অনেক করিয়া, মাকেও খাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু মা কর্ণপাত করিল না।···কার্য্য শেষ করিয়া শয়নকক্ষে আসিল। মনোহর তখনও ভাবিতেছিল আর লিখিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও বিরক্তির কোনো চিহ্ন নাই।

সুহাসিনী, কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া কোনো কথা না বলিয়া শয্যায় শয়ন করিল। দুঃখ ও অভিমানে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। কেন, কিসের জন্য স্বামী এত পরিশ্রম করেন? দিন নাই, রাত নাই, ছুটি পর্য্যন্ত নাই! কিসের জন্য, কোন্ আশায় এই অমানুষিক পরিশ্রম উনি করিতেছেন? এত কাজ, এমন জিদ যে, খাওয়ার পর্য্যন্ত

সময় হয় না ? এমন করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া কেন ? কি তাহার অপরাধ ? কিসের প্রত্যাশী সে যে, এই টাকা-উপায়ের 'অছিলা' করিয়া তাহাকে এই শাস্তি দেওয়া ? একদিনের জন্যও কি সে বলিয়াছে যে, তাহার এই জিনিস চাই ! তবে ?

সুহাসিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। কণ্ঠ ভেদিয়া ক্রন্দন আসিতে লাগিল। অতি কষ্টে ক্রন্দন দমন করিলেও তাহার অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, চিত্তভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে সুহাসিনী ধীরে-ধীরে সজল-চক্ষে ঘুমাইয়া পড়িল।

অসাধারণ শক্তি ও উৎসাহে মনোহর লিখিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যখন ভগবানের কৃপায় কল্পনা ও জ্ঞানের দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে, তখন এই সুযোগ—এই দুয়ার বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত লেখা শেষ করিতে হইবে। হয়তো-বা এমন সুযোগ আর আসিবে না। মনোহর দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিতে লাগিল। ক্রমে লেখা শেষ হইয়া আসিল। শেষ পরিচ্ছেদে হিন্দু-সভ্যতা, মুসলমান-সভ্যতা ও ইংরেজী-সভ্যতার বিশেষত্ব ও পার্থক্য অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়া পুস্তক সমাপ্ত হইল। এতদিনকার আশা আজ সফল হইল। এতদিনে মনের মতন করিয়া একখানি বই লিখিতে পারিল। আনন্দে মনোহরের সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। মনোহর কলম রাখিয়া, দুয়ার খুলিয়া একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন শেষ রাত্রি। চারিদিকে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। আকাশে চন্দ্র যেন জ্যোৎস্না-সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বৃক্ষ, লতা, তৃণ মণ্ডিত ধরণীতল সিক্ত, স্নাত, প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া আনন্দের ধারায় মনোহরের সমস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই আনন্দের ভাগ কাহাকেও দিবার জন্য তাহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সে গৃহমধ্যে আসিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। বামদিকের শয্যার উপর শিশুপুত্রকে কোলের কাছে লইয়া সুহাসিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শয্যার দিকে চাহিতেই, সুহাসিনীর অশ্রু-জলাঙ্কিত ম্লান মুখ মনোহরের চক্ষে পড়িল।

হঠাৎ কে যেন অন্তর হইতে বলিল, যৌবনাবধি আজপর্য্যন্ত এই অভাগিনী নারীর কি কষ্টে কাটিয়াছে তাহার কোনো সংবাদ রাখ? ইহার মুখের কঠিন ভাষাকেই চিরকাল বড় করিয়া দেখিয়াছ; অন্তরের দুঃখ-সমুদ্রের পানে তো কোনো দিন ফিরিয়াও চাও নাই!

অনুশোচনায় মনোহরের অন্তর ভরিয়া গেল। হঠাৎ বক্ষের বামদিকে একটি অতি তীব্র বেদনা বোধ হওয়াতে মনে হইল, এই বুঝি তাহার শেষ-ক্ষণ। তাহাই কি? যদি তাহাই হয়, আজিকার উচ্চারিত প্রেমহীন কঠোর বাণীই কি সুহাসিনীর প্রতি প্রযুক্ত শেষ-বাণী হইবে? তাহা হইলে, কি তাহার অবলম্বন হইবে? কি লইয়া সে থাকিবে? যদি আজই এইক্ষণে

চিরকালের মত চলিয়া যাইতে হয়, যে, চিরদিন চিররাত্রি তাহার সঙ্গে শুধু দুঃখ ভোগই করিয়া আসিয়াছে, তাহার সান্ত্বনার জন্য কি রাখিয়া যাইবে ?

বামহাতে ব্যথিত-স্থানটিকে টিপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হাত দিয়া খাতা হইতে একখানি সাদা পাতা ছিঁড়িয়া মনোহর প্রাণপণ চেষ্টায় লিখিল :—

"সুহাসিনী,

আমাকে ক্ষমা করিও। রাগ করিয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা আমার অন্তরের কথা নহে। তোমার নিঃস্বার্থ প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমি জানি। আজ এই শেষ-ক্ষণে তোমার মধুর হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইতেছি। সেখানে বিন্দুমাত্র স্বার্থ নাই। আছে শুধু পরিপূর্ণ প্রেম ও স্নেহ। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। হয়তো আর দেখা হইল না। কিন্তু জানিও, বিশ্বাস করিও, তোমার প্রতি অবিচল প্রেম লইয়া আমি চলিলাম। আমার কঠিন বাক্য, তিক্ত ব্যবহার ক্ষমা করিও। অভাব, দৈন্য, দুঃখ তোমার প্রতি আমার অগাধ প্রেমকে আড়াল করিয়াছিল মাত্র—তাহাকে মলিন বা নষ্ট করিতে পারে নাই। তোমার উপর আমি পুত্র-কন্যাদের ভার দিয়া, অনিচ্ছায় চলিলাম। যত দিনেই হউক আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।

শেষের দিকটায় মনোহরের লেখা জড়াইয়া আসিল। আর কলম চলে না। কোনো রকমে পত্র শেষ করিয়া অত্যন্ত জড়িত-

অক্ষরে নাম লিখিয়া মনোহর ভাবিল, যেটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কি সুহাসিনীর কাছটিতে কোনোপ্রকারে আপনাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না? একবার সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বেদনা তীব্রতর রূপে দেখা দিল। সঙ্গে-সঙ্গে টেবিলের উপরকার প্রসারিত পাণ্ডুলিপির উপর তাহার শ্রান্ত শির লুটাইয়া পড়িল। আত্মা—মুক্তি পাইল।

রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল। মুক্ত দুয়ার দিয়া ঊষার স্নিগ্ধ আলোক আসিয়া তাহার এতদিনকার তাপদগ্ধ লুণ্ঠিত দেহে শীতল হস্ত বুলাইয়া দিল।

*

*　　　*

কিছুক্ষণ পরেই সুহাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখিল, মুক্ত দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে দিনের আলোক আসিয়াছে, টেবিলের উপর প্রজ্বলিত আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছে, আর স্বামী তাহারি কাছে মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছেন। প্রথমটা মনে হইল, বুঝি সারারাত্রি লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া এইভাবে বিশ্রাম করিতেছেন। সুহাসিনী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, দেখিল, স্বামী সেইভাবেই পড়িয়া রহিলেন। ভাবিল, এইভাবেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। মনে অনুশোচনা জন্মিল—কেন সে সারা রাত্রির মধ্যে একটিবারও স্বামীকে ডাকে নাই।

সুহাসিনী উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, উঠে বিছানায় গিয়ে শোও···ওঠো···শুনচো ? পরক্ষণে দারুণ ও কঠিন সত্য, বজ্রাঘাতের মত সুহাসিনীকে অভিভূত করিয়া দিল। ক্ষণপরে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া সুহাসিনী স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

চীৎকারের শব্দে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। লতিকা ও রামপ্রসাদ সর্ব্বপ্রথম ছুটিয়া আসিল। পিতামাতাকে

তদবস্থায় দেখিয়া তাহারা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর কাঁদিতে-কাঁদিতে দুইজনেরই গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল। অল্প অভিজ্ঞতাতেই দুইজনে বুঝিল যে, মায়ের মূর্চ্ছা হইয়াছে, পিতা আর উঠিবেন না। দুইজনে চারিদিকে অকূল-পাথার দেখিল।

লতিকা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যেই বুদ্ধি করিয়া কহিল—রামু, শীগ্‌গির গিয়ে অমর-দাকে ডেকে নিয়ে আয়। রামপ্রসাদ অশ্রু মুছিতে-মুছিতে অমরদের গৃহের উদ্দেশে ছুটিল।

তাহার পর অমর আসিয়া দুইজনের অবস্থা দেখিল। অমরের পিতা চন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। প্রতিবেশীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি আসিয়া সুহাসিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মনোহরের দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—তাঁহার মৃত্যু ঘণ্টাখানেক, কি কিছু বেশীক্ষণ হইয়াছে। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই মৃত্যুর কারণ।

চৈতন্য হওয়ার পর হইতে সুহাসিনী স্তম্ভিত হইয়া রহিল। দেখিলে মনে হয় যেন তাহার কাঁদিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবু দাঁড়াইয়া থাকিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রামেরই কয়েকটি যুবক ও একজন প্রৌঢ় সৎকারের ভার লইলেন। অমরও তাঁহাদের মধ্যে রহিল।

যাইবার আগে অমর একখানি কাগজ লতিকার হাতে দিয়া

কহিল—এখানি স্যারের চিঠি. রেখে দাও, আমরা বাইরে গেলে, কাকীমার হাতে দিও। অধীর হয়ো না। কথিকার হাতে খোকার ভার দিয়ে তুমি মাকে দেখো। মায়ের কাছে-কাছে থেকো। আমি শীগ্‌গির ফিরে আসবো।

মৃতদেহ লইয়া সকলে বাহির হইয়া গেল। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বেও—পুঞ্জীভূত উত্তপ্ত বারিরাশি অভ্যন্তরে লইয়া পৃথিবী যেমন শান্তমুখে চাহিয়া থাকে, তেমনি সুহাসিনী অন্তরে অবরুদ্ধ শোকরাশি লইয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কথিকা-যূথিকা কাঁদিয়া উঠিল, খোকাও না-বুঝিয়া সে-ক্রন্দনে যোগ দিল। লতিকা ও রামপ্রসাদ সজল নয়নে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিল; সুহাসিনী উদাসদৃষ্টিতে একবার তাহাদের পানে চাহিল, আর একবার যেদিকে এইমাত্র স্বামীর মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে সেইদিকে চাহিল, তারপর ছুটিয়া মৃতদেহের অনুসরণ করিতে গিয়া দুয়ারের ধাক্কা লাগিয়া সেইখানে হতচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

লতিকা ও রামপ্রসাদ সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া মাতার সংজ্ঞাহীন লুণ্ঠিত দেহ ধরাধরি করিয়া কক্ষমধ্যে আনিল। তারপর মাথায় জল ও বাতাস দিয়া চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুহাসিনী চক্ষু মেলিয়া চাহিল ও ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল। রাত্রিকার শয্যা, টেবিলের উপরকার ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কাগজপত্রাদি, পুত্রকন্যাদের উদ্বিগ্ন সজল নয়ন

দেখিয়া সব কথা মনে পড়িল। লতিকা সময় বুঝিয়া অমরনাথের দেওয়া সেই পত্রখানি মায়ের হাতের কাছে আনিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—বাবা এই শেষ পত্রখানি তোমাকে লিখে গেছেন। একটিবার প'ড়ে দেখ মা!

সুহাসিনীর মনে পড়িল, কাল কত কঠিন কথা স্বামীকে সে বলিয়াছিল; তাহা ভুলিতে না পারিয়া সেইসব উল্লেখ করিয়াই বুঝি তিনি এই পত্রে অনুযোগ করিয়া গিয়াছেন। তখন কম্পিত হস্তে কন্যার হস্ত হইতে পত্র লইয়া সুহাসিনী মনে-মনে পড়িতে লাগিল।

যাহাতে অনুযোগ, ভর্ৎসনা, হয়তো-বা কতকগুলা কটু ও কঠোর কথা পাইবে ভাবিয়াছিল, তাহাতে এমন অটল বিশ্বাস ও এমন গভীর প্রেমের স্নিগ্ধ ও সরস অভিব্যক্তি পড়িয়া সুহাসিনীর দুঃখদৈন্য কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া গেল এবং অন্তরের অবরুদ্ধ শোকরাশি উদ্বেলিত হইয়া নেত্রপথে অশ্রুপ্লাবন ভরিয়া আনিল।

তখন লতিকাকে দুই হাতে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সুহাসিনী উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বুঝি এতক্ষণে শান্তি মিলিল।

---

*

*　　*

স্কুলে কয়দিনের বেতন পাওনা ছিল, ছেলে-পড়ানোর টাকাও কিছু বাকি ছিল, এবং নরহরি এক বৎসরের হিসাব—পঁচাত্তর টাকার পরিবর্ত্তে আপনা হইতে আসিয়া একশত টাকা দিয়া গেল। তাহাতেই চন্দ্রনাথের পরামর্শে অল্পে শ্রাদ্ধ সারিয়া, মাসখানেকের খরচের উপযোগী টাকা হাতে রহিল। সংবাদ পাইয়া রামপ্রসাদের জ্যাঠাও আসিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পর তিনি চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—এখানকার কাজকর্ম্ম সব মিটাইয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়াই ভালো। আর এখানে থাকিয়া কি হইবে।

সংসারের কর্ত্তার মৃত্যু হইলে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদেরই প্রয়োজন হয় যে, তিনি কি পরিমাণে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। যতই অকাব্য হউক, ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, মানুষ মাত্রেরই সর্ব্বপ্রথম কাজ তাহার বাঁচিবার চেষ্টা।

চন্দ্রনাথবাবু যেদিন লতিকার সহিত অমরের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই মনোহরের মৃত্যু

হয়। ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর মনে বড়ই ক্ষোভ হইয়াছিল। কি উপায়ে এই হতভাগ্য-পরিবারের কিঞ্চিৎ উপকার করেন, কি করিয়া এতগুলি ছেলেমেয়ের অন্নবস্ত্র সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, ইহাই তাঁহার চিন্তা হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশমত শ্রাদ্ধের পরদিন অমর আসিয়া সুহাসিনীকে বলিল—বাবা, ব'লে দিলেন, এখন কি ক'রে সংসার চলবে তাই ভাবার দরকার। স্যার টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন কিনা, ঘর বাড়ীই-বা কি-রকম, তাই জানতে চেয়েছেন। আপনি কিন্তু এতে দুঃখ করবেন না কাকীমা, বাবা বিশেষ ক'রে এই কথা ব'লে দিয়েছেন।

সুহাসিনী বিগলিত অশ্রু মুছিয়া বলিল—দুঃখ যে এখন ভগবান্ সইতে দিয়েছেন, বাবা! দেশে বিষয়-আশয় যা আছে তা অতি সামান্য। বাড়ীঘর যে-রকম, তাতে বাস করা চলে।

অমর জিজ্ঞাসা করিল—তার দাম কত হতে পারে?

সুহাসিনী বলিল—অর্দ্ধেক অংশের দাম, এক হাজার টাকা হতে পারে।

অমর একটু সঙ্কোচের সহিত বলিল—লাইফ-ইন্সিওর ছাড়া আর কোনো টাকা বোধহয় রেখে যেতে পারেননি?

সুহাসিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সংসারই কষ্টে-স্বষ্টে চলতো। লাইফ-ইন্সিওর কোথা থেকে করবেন!

অমর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—স্যারের লাইফ-ইন্সিওরেন্স ছিল, আপনি জানতেন না কাকীমা? মায়ের

বাক্সটা একবার খুলে দেখ তো লতু,—নিশ্চয়ই পলিসিখানা তাতেই পাওয়া যাবে।

লতিকার কাছেই চাবি ছিল। সে উঠিয়া বাক্সটা খুলিয়া দেখিতে গেল। একটু পরে সত্য-সত্যই একখানা পলিসি লইয়া ফিরিয়া আসিল। অমর লতিকার হাত হইতে সেইখানি লইয়া পড়িয়া বলিল—স্যার পাঁচ হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স ক'রে গেছেন। এই মাইনে থেকে যে তিনি এই ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারবেন তা ভাবিনি। কাকীমাকেই nominee ক'রে গেছেন। টাকা তোলবার কোনো অসুবিধা হবে না।

কথাটা খুব বড়, বা বেশী নহে। একজন স্ত্রীর নামে পাঁচ হাজার টাকা জীবন-বীমা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বিশেষত্বই বা কি? কিন্তু কি করিয়া, কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা সহিয়া, দিবারাত্রি কি কঠিন পরিশ্রম করিয়া স্বামীকে এই টাকার সংস্থান করিতে হইয়াছে তাহা সুহাসিনীই জানে। তাহার মনে পড়িল, মৃত্যুর দিনেই তাহার একটা কঠিন কথার উত্তরে স্বামী বলিয়াছিলেন—'নিজের দরকার কি কার দরকার, যেদিন জানবে, সেদিন বুঝবে।' আজ সে-কথা সুহাসিনী মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিয়াছে। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

সুহাসিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া অমর তাহাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে কহিল—প্রভিডেণ্ড-ফণ্ড ছ'শো টাকার কিছু উপর আছে। আপাতত তাই থেকে সাবধানে খরচ চালাতে হবে।

আমরা ভেবেছিলাম, স্যার বড়-জোর এক হাজার টাকার ইন্‌সিওরেন্স ক'রে গেছেন। বাবা কালও বলছিলেন, কি ব্যবস্থা করতে পারলে রামু মানুষ হওয়া পর্যান্ত কষ্টে-সৃষ্টে চলে যায়। এখন মনে হচ্ছে, সে-রকম ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না।

স্যারের বই দু'খানা থেকেও কিছু সংস্থান হবে আশা করা যায়। Noteখানা আমার জানা-শোনা এক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। তাঁদের পছন্দ হয়েছে—ছাপাবো বলেছেন। আর Text bookখানি স্যার সমস্ত প্রাণ দিয়ে লিখেছেন···অতি সুন্দর হয়েছে। এখানি কোনো নামজাদা প্রকাশককে দিতে হবে! বাবাকে আমি এই খবরটা দিয়ে আসি।

বলিয়া অমর ধীরে-ধীরে উঠিয়া পড়িল।

অমর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র সুহাসিনী উঠিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। লৌহ-শলাকার মত এই চিন্তা তাহার হৃদয়ের মধ্যে বাজিতে লাগিল—তুমি এই হতভাগিনীর জন্য এত ভাবিয়াছ, এত পরিশ্রম করিয়াছ, অথচ একটা দিনের জন্য এ-কথাটা বল নাই কেন? আমি যে তোমাকে কত কঠিন কথা বলিয়াছি; নিজের দুঃখের কথা ভাবিয়া, তোমার দুঃখের কথা যে একটিবারের জন্যেও মনে করি নাই। যখন তুমি সংসারের কথা ভাবিয়া সারা হইতেছ, তখনও তুমি ঘোর উদাসীন মনে করিয়া তোমার

প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছি। আমি কি করিয়া তোমার বুকের রক্তে সংগৃহীত অর্থে এই তুচ্ছ হীন জীবন ধারণ করিব! এ অভাগিনীকে এত ভালোবাসিয়া শেষে এমন শাস্তি দিয়া গেলে কেন গো? কেন?

*

* *

তারপর মাসখানেকের মধ্যেই জীবন-বীমার টাকা সব পাওয়া গেল। চন্দ্রনাথবাবু সুহাসিনীর নামে তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া দিলেন, দেড়-হাজার টাকা নিকটবর্ত্তী একটি পিপল্‌স্‌ ব্যাঙ্কে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য বেশী সুদে রাখিলেন ও পাঁচশত টাকা সুবাসপুরের এক ধর্ম্মভীরু ব্যবসায়ীকে শতকরা এক টাকা সুদে হ্যাণ্ডনোটে ধার দেওয়া হইল। এইভাবে মাসিক প্রায় ত্রিশ টাকা আয়ের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে কষ্টে-স্থষ্টে সংসার চলিতে পারে বটে, কিন্তু দশ টাকা বাড়ীভাড়া দিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। তাহার উপর নিজেদের যে-রকমই হউক একটা বাড়ী থাকিতে, এ-অবস্থায় পরের বাড়ীতে থাকিয়া কি লাভ? ব্যয়-সঙ্কোচ চিরদিনই ছিল, এখন আরও সঙ্কোচ করিতে হইবে। চন্দ্রনাথ-বাবু দেশে গিয়া থাকিতে পরামর্শ দিলেন। সুহাসিনীও তাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিল। অমরের ছুটিও ফুরাইয়া আসিয়াছিল। স্থির হইল, অমর উহাদের দুর্গাপুর পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতা যাইবে।

মাত্র একজনের অভাবে আজ এত বৎসরের বাসস্থান—এতদিনকার গৃহ এমনি করিয়া চিরদিনের মত ছাড়িয়া যাইতে

হইতেছে। কত আশা বুকে করিয়া সুহাসিনী এই গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। সে আশার কতটুকু পূর্ণ হইয়াছিল—কতটুকুই-বা অপূর্ণ ছিল তাহার হিসাব না থাকিলেও, যে নিরাশার মাঝে তাহাকে বিদায় লইতে হইতেছে, তাহার যে শেষ নাই! হউক পরের গৃহ, তবু এই গৃহের মাঝে কত-শত স্মৃতি জড়িত আছে—যে স্মৃতি তখন সুখের বলিয়া একটিবারও বুঝা যায় নাই। কিন্তু আজ তাহা হইতে দূরে আসিয়া সে তাহার সত্যকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে। চোখের জলে ভাসিতে-ভাসিতে সুহাসিনী সুবাসপুর ত্যাগ করিল।

অমরের সহিত লতিকার বিবাহের প্রস্তাব যে চন্দ্রনাথবাবু খুব ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহা অমর ও লতিকা দু'জনেই জানিত, কিন্তু এতদিন দু'জনের কেহই সে-প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ করে নাই। দুর্গাপুরে একদিন থাকিয়া অমরের কলিকাতা যাইবার কথা। সুহাসিনীর অনুরোধে অমরকে আরও একদিন থাকিতে হইল। যাইবার দিন অমর সুহাসিনীকে একা পইয়া বলিল—বাবা আপনাকে একটা কথা বলতে বলেছেন।

সুহাসিনী বলিল—কি কথা, বলো!

অমর মাথা নীচু করিয়া বলিল—লতুর বিয়ের সম্বন্ধ বাবা দেখবেন, আপনাকেও দেখতে বলেছেন। আরও বলেছেন যে, লতুর বিয়ের খরচ বাবা দেবেন। আপনি সেজন্য কিছু ভাবেবেন না। এ-খরচ আপনাকে নিতেই হবে।

সুহাসিনী বলিল—তাঁর কোন্ জিনিষটা নিইনি বাবা? আর, তোমরা ছাড়া আমাদের এখন আর আপনার কে আছে? এখানে কেই-বা আমাদের দেখবে, আর, ভালো পাত্র কোথায়-বা পাবো? তাঁকে বোলো, তিনিই যেন দয়া ক'রে একটু সন্ধান করেন।

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একদিনের একটা আশার কথা ভাবিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, তেমনি যদি হইবে তো ভগবান্ এমন কেন করিবেন!

লতিকার সহিত দেখা করিয়া অমর বলিল—আমি যাচ্ছি, ঠিকানা রইলো, চিঠি দিও। আমি তোমাকে সেদিন যে-কথা বলেছিলাম, সে-সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে নেই। সে-সব কথা তুমি শুনেছো। আমায় ক্ষমা করো!

যে ক্ষমা করিবে সে তখন চোখের জলে ভাসিতেছিল। তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের পানে ক্ষণকাল গভীর দুঃখের সহিত চাহিয়া অমর বলিল—লতু, তুমি কাতর হয়ো না। তোমার উপর এখন কত-বড় ভার, ভেবে দেখ। তুমি ভেঙে পড়লে কি ক'রে চলবে? স্যার তোমাকে কত যত্নে, কত আশায় নিজে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর সে শিক্ষা ভুলো না।

লতিকা অশ্রু মুছিয়া ধীরে-ধীরে বলিল—বাবার শিক্ষা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তাঁর সব ইচ্ছা ঈশ্বরের বিধান ব'লে মেনে নিচ্ছি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, দরকার হ'লে

আমি যেন স্বাবলম্বন গ্রহণ করতে পারি। এখন তাই দরকার হয়েছে। আমি তাই গ্রহণ করবো। আমাকে তুমি একটা কাজ খুঁজে দাও—আমি সেই কাজ নিয়ে থাকবো আর ছোট ভাই-বোনদের মানুষ করবো। আমি যেমন আছি তেমনি থাকবো। তুমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও, আমি যেন নিজের ধর্ম্ম রাখতে পারি, আর বাবার অতি ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি পর্য্যন্ত যেন পূর্ণ করতে পারি।

বলিয়া লতিকা নতজানু হইয়া অমরকে প্রণাম করিল। তারপর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দ্রুতবেগে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে অমর কলিকাতা যাত্রা করিল। দুঃখ ও নিরাশার ভারে তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতেছিল। তথাপি কোথা হইতে পিক-কণ্ঠের সঙ্গীতের মত তাহার ব্যথিত হৃদয়ে আনন্দের স্পর্শ জাগিতেছিল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

অমর কলিকাতায় পৌঁছিবার একদিন পরেই অপ্রত্যাশিত ভাবে লতিকার একখানি পত্র পাইল। পরম আগ্রহভরে পত্রখানি খুলিয়া অমর রুদ্ধ-নিশ্বাসে পড়িল ঃ

শ্রীচরণেষু,

তোমার সাক্ষাতে একটা কথা বলিতে পারি নাই। আজ তাহা লিখিয়া জানাইতেছি।

বাবা আমাকে তোমার হাতে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

তুমি একদিন হয়তো ভালোবাসিয়া আমার এই আভরণশূন্য মলিন মাধুর্য্যবিহীন হাত তোমার মধুর সুন্দর দেবদুর্লভ হাত দু'খানির মধ্যে লইয়াছিলে। সেদিন হইতে আমি জানিয়াছি ও কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি, তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছ। এখন লোক-চক্ষে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও, বা আর কাহাকে গ্রহণ করিলেও, আমার সে-বিশ্বাস জীবনে বিন্দুমাত্র শিথিল হইবে না।

ইহার পর, আশা করি তুমি আমার 'ব্যবস্থা' করিবার জন্য আর ব্যস্ত হইবে না। আমার প্রণাম জানিও।

তোমার চিরজীবনের সেবিকা—

লতিকা

পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল। তবুও বহুক্ষণ অমরের অশ্রুসজল দৃষ্টি পত্রের উপর নিবদ্ধ রহিল। মন চলিয়া গেল দূর অতীতের মধ্যে—যেদিন সে লতিকার অমল-কোমল সর্ব্বমাধুর্য্যমণ্ডিত হাতখানি বড় ভালোবাসিয়া আপনার হাতের মধ্যে লইয়া জীবনের প্রথম প্রণয়বাণী বলিয়াছিল···যাহাকে বলিয়াছিল, সেও বিপুল বিস্ময় ও অপূর্ব্ব আনন্দে অধীর হইয়া, হৃদয়ের দুরু দুরু শব্দের মাঝে জীবনে সেই প্রথম প্রেমের অমৃত-মধুর বার্ত্তা শুনিয়াছিল সেইখানে।

---

*

* *

সুহাসিনীদের বাড়ী আসা লইয়া মনোহরের দাদা কেদার ও তাঁহার স্ত্রীর বচসা হইয়া গিয়াছিল। কেদারের স্ত্রী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ছেলেমেয়ে লইয়া সুহাসিনী আবার তাঁহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু, বাড়ীতে আসিয়া যখন তাহারা শুধু তাহাদের বাড়ীর অংশ লইয়া পৃথক্ আহারাদির ব্যবস্থা করিল, তখন অশান্তির আশঙ্কা অনেকটা কমিয়া গেল। এমন কি, কেদারের স্ত্রী নিরাপদে এ-কথাটাও কয়েকদিন বলিলেন—আগেকার মত একসঙ্গে থাকলেই হতো, বিশেষ যখন ঠাকুরপো নেই···তবু দু'পাঁচ টাকা যা আছে, বাঁচতো। মেয়েগুলোর ত' বিয়ে দিতে হবে! সুহাসিনী অবশ্য সেটা মাত্র মুখেরই কথা মনে করিয়া লইয়া নিজের সংসার নিজেই কষ্টে-সৃষ্টে চালাইতে লাগিল। কাজেই সংসার অশান্তির হাত হইতে অনেকটা বাঁচিয়া গেল।

গোলযোগ ঘটিল, লতিকাকে লইয়া। লতিকার বয়স, সতেরো পার হইয়াছিল ও সে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিল। তাহার উপরে বিবাহের কোনো কথাবার্তা হইতেছিল না।

প্রতিবেশীদের কথায় এবং স্ত্রীর গঞ্জনায় কেদার দু'একটা সম্বন্ধ আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু তাহারা আসিয়া শুধু মিষ্টান্ন খাইয়াই চলিয়া গেল। লতিকা কিছুতেই তাহাদের

সম্মুখে বাহির হইল না। শেষে কেদারকে বলিতে হইল, মেয়ের জ্বর হইয়াছে। তারপর রাগ করিয়া এ চেষ্টা ত্যাগ করিল।

সুহাসিনী লতিকাকে বলিল—এ-রকম জিদ্ করলে কি ক'রে চলবে, মা? মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছিল তখন তো বিয়ে করতেই হবে। অনর্থক এ লোকনিন্দা কেন?

লতিকা বলিল—তুমি তো জানো মা, বাবার ইচ্ছা ছিল যে, যদি দরকার হয় আমি যেন নিজের ভার নিজে নিতে পারি। বাবার অবর্ত্তমানে সে-দরকার আরও বেশী হয়েছে। রামু এখনও ছেলেমানুষ; খোকার কথা ছেড়েই দাও! ওদের সব লেখাপড়া শেখাতে হবে। কণিকা, যূথি সবারই ভার তোমার উপর। এ-সময়ে তোমাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত, মা? আমি কাছে থাকলে তোমার কি একটু ভালো লাগবে না?

সুহাসিনী স্নেহের স্বরে বলিল—তুই তো সংসারের সবই কচ্ছিস মা! আমি তো আজকাল কিছুই করতে পারি না। তুই গেলে কি ক'রে সংসার চলবে এই ভেবে আমি সারা হচ্ছি। কিন্তু, তোকে তো যেতেই হবে মা!

লতিকা বলিল—কেন হবে মা? আমি যদি তোমার ছেলে হতাম, তাহ'লে কি তোমায় এ-সময়ে ফেলে চলে যেতাম?

সুহাসিনী বলিল—তা যেতিসনি। কিন্তু ছেলের এক পথ

—মেয়ের যে আর-এক পথ, মা! বিয়ে হলেই যে তুই আমাকে দেখতে পারবি না, তারই-বা ঠিক কি? তখন হয়তো আরও ভালো ক'রে পারবি।

লতিকা বলিল—সে-কথা ব'লো না মা। ক'জন মেয়ে বিয়ের পর তাদের মা-বাপকে দেখতে পারে, বলো ত'? ছেলের পিতৃ-মাতৃভক্তি বড় গুণ, কিন্তু মেয়ের বেলায় তা দোষ হয়ে দাঁড়ায়। মা-বাপকে যে যত ভুলতে পারবে, সে তত ভাল বৌ হবে তা তো জানো মা!

সুহাসিনী একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তাহ'লে তুই কি করতে চাস্ স্পষ্ট ক'রে বল্।

লতিকা বলিল—দুটো বছর পরে রামু ম্যাট্রিক দেবে। এখন থেকে চেষ্টা করলে, বৃত্তিও দিতে পারে। তখন কি মা এই পঁচিশ টাকায় চলবে! না, পয়সার অভাবে রামু লেখাপড়া শিখতে পাবে না—সেই ভালো হবে? আমি আস্‌ছে বছর আই. এ. দেবো, দিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করবো। যদি পঁচিশ টাকাও আনতে পারি, রামুর কলেজের খরচ চলবে।

সুহাসিনীর চোখে জল আসিল। বলিল—তাহ'লে তোর জীবনে কি হলো মা? তোর জীবন যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল!

মায়ের চোখের জল মুছিয়া দিয়া লতিকা বলিল—কেন ব্যর্থ হবে মা! সংসারে কত লোক পরের জন্যে পরিশ্রম করেছে—

কত ত্যাগ করেছে। কোনো মেয়ে যদি বিয়ে না ক'রে, মা-বাপের সেবা করে, তাতে তার জীবন কেন সার্থক হবে না, মা? আমি তো চুপ ক'রে ব'সে থাকতে চাইছি না!

সুহাসিনী মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল—মায়েরও তো মেয়ের উপর কর্ত্তব্য আছে। মায়েরও তো মেয়ে-জামাই নিয়ে সংসার করতে সাধ যায়।

লতিকা বলিল—সে সাধ তুমি কথিকে নিয়ে, যূথিকে নিয়ে মিটিও মা। আমায় তুমি ছেলের মত তোমার সেবা করবার অধিকার দাও, তাতেই আমার সুখ হবে। তোমার কাছ থেকে আমায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রো না।

মায়ের বুকের উপর মাথা রাখিয়া বলিতে-বলিতে লতিকা কাঁদিয়া ফেলিল। সুহাসিনী কন্যার মাথায় ধীরে-ধীরে হাত বুলাইয়া সজল নয়নে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

---

*

*　　　*

পরের বৎসরে লতিকা প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করিল। ইহার কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের একস্থানে সে বালিকাদের মধ্য-ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ পাইল। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে সাধারণভাবে আবেদন পাঠাইয়াছিল। যেদিন তাহার নামে চল্লিশ টাকা বেতনের নিয়োগপত্র আসিল, সেদিন আর তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। এতদিনে সে তার দুঃখিনী মাকে সত্যকার সাহায্য করিতে পারিবে, ছোট ভাই-বোনদের খাইবার পরিবার দুঃখ কিছু দূর করিতে সমর্থ হইবে। রামুর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও বোধহয় হইবে।

অজানা নূতন পথে চলিতে হইবে; নূতন স্থানে অজানা লোকের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নূতন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। কত লোকে মন্দ বলিবে—নিন্দা করিবে। তথাপি এই পথই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

লতিকা এই বয়সে চাকরি করিতে যাইবে শুনিয়া কেদার রুষ্ট হইলেন, কেদারের স্ত্রী কথা বন্ধ করিলেন, প্রতিবেশীরা নানা কথা বলিতে লাগিল। এই অপ্রসন্নতার মধ্যে রাম-

প্রসাদকে সঙ্গে লইয়া লতিকা মাতার আশীর্ব্বাদ ও আপনার মনের বল সম্বল করিয়া কার্য্যস্থানে যাত্রা করিল।

নূতন স্থানে পৌঁছিয়া লতিকা দিন-দুই একটু অন্যমনা হইয়া রহিল। বিদ্যালয়-সংলগ্ন বাসগৃহ ও একটি দাসী পাওয়া গেল। একটি বৃদ্ধ ভৃত্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করিবার উপযুক্ত। বিদ্যালয়ে আরও দুইজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, একজন বৃদ্ধ শিক্ষক আছেন, যিনি বহু বৎসর হইতে ছোট-ছোট মেয়েদের—স্থানীয় জমিদারের একটা বড় দালানে পড়াইতেন।

লতিকা শুনিল, এই বিদ্যালয়ের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি নানা দেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছেন। অতি সজ্জন লোক, সাধু প্রকৃতি। তাঁহারই টাকায় বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন...যথেষ্ট নগদ টাকাও স্কুলের নামে জমা করিয়া দিয়াছেন...যাহার সুদ ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিদ্যালয় চলিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, দরকার হইলে, বিদ্যালয়ের মঙ্গলের জন্য এখনও টাকা দিয়া থাকেন। এত করিয়াও বিদ্যালয়ের কর্তৃত্বভার তিনি কমিটির উপর স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু, কমিটির একান্ত আগ্রহে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট থাকিতে হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার এমন একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে যে, অর্থসাহায্য ছাড়াও যখন যে সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা দিবার জন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত রহিতেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ভালো-ভালো বই, ছাত্রীদের জন্য চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর আদর্শ-

সম্বলিত পুস্তক দিয়া যাইতেন ; স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাহা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতেন, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগকে তাহা অসঙ্কোচে বলিতেন।

লতিকার অল্প বয়স, স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ও বিনম্র কথাবার্ত্তা দেখিয়া বৃদ্ধ শিক্ষকটি আপনা হইতে বলিলেন—মা, আপনি একটিবার আশুতোষবাবুর সঙ্গে আজই দেখা ক'রে আসুন। তিনি এখন এখানে আছেন, আবার হয়তো চলে যেতে পারেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর কাছে আপনি অনেক দরকারী উপদেশ পাবেন।

লতিকা বলিল—আপনি যদি দয়া ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান তো ভাল হয়।

বৃদ্ধ বলিলেন—বেশ, আজ ছুটির পর গেলেই হবে। তাঁর বাড়ী তো এই কাছেই !

বিদ্যালয়ের ছুটির পর রামপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া, বৃদ্ধ-শিক্ষকের সঙ্গে লতিকা আশুতোষবাবুর গৃহের উদ্দেশে বাহির হইল। বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে তিনি তখন গাছপালার তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। কোনো গাছটিতে জল দিতেছিলেন, কোনো গাছের তলাকার মাটিটা আল্‌গা করিয়া দিতেছিলেন, কোনো গাছের নীচে পাতা পরিষ্কার করিতেছিলেন। বৃদ্ধ-শিক্ষকের সঙ্গে লতিকাকে দেখিয়া তিনি হাতের কাজ ফেলিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আশুতোষবাবু নিকটবর্ত্তী গাছের তলায় আসন আনাইয়া

তাঁহাদের বসাইলেন, তারপর নিজেও একটি আসনে বসিয়া বৃদ্ধ-শিক্ষকের পানে চাহিয়া বলিলেন—পণ্ডিতমশাই, এইটি বুঝি আমাদের নতুন বড়-মা ?

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁর বয়স অল্প, নতুন জায়গায় এসে ভাবনাও একটু হচ্ছিলো—সেইজন্যে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে নিয়ে এলাম।

আশুতোষবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—তার জন্যে ভাবনা কেন মা ? এখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

লতিকা বলিল—আমি এবার আই. এ. পাশ করেছি। শিক্ষয়িত্রীর কাজে কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমার। শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার অসীম জ্ঞান। সেইজন্যে আপনার কাছে উপদেশ নিতে এসেছি, যাতে ক'রে—আমাকে যে-কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছেন, যেন তার উপযুক্ত হতে পারি।

আশুতোষ। তা তুমি হবে মা। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝেছি। তোমার দরখাস্তে তুমি তো সব কথাই প্রকাশ ক'রে লিখেছিলে। তুমি শিক্ষকের মেয়ে···কি ক'রে বাপের যত্নে ও নিজের চেষ্টায় পাশ করেছো···এ-সব পড়েই তো আমার মনে হলো তুমি এ-কাজ পারবে। এখন তোমাকে দেখে সে-বিশ্বাস আমার দ্বিগুণ হয়েছে।

লতিকা। শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সব বই আপনি স্কুলে দান করেছেন সে-সব আমি পড়বো। আপনার উপদেশমত

চলবো। মেয়েদের কল্যাণের চিন্তা ও নিজের জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করবো।

আশুতোষ। তাহ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মনের প্রবল ইচ্ছাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। কাজে থাকলে, কাজের পদ্ধতি জানতে দেরী হবে না।

লতিকা। আমাকে আপনি নিজের মেয়ের মত একটু স্নেহের চক্ষে দেখবেন এই আমার প্রার্থনা।

আশুতোষ। তোমাকে আমি মেয়ের মতই দেখবো মা, কাজেই, একটু-স্নেহের চক্ষে দেখলে তো চলবে না; একটু বেশী, যতখানি এই অক্ষম বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব হয়, ততখানি স্নেহের চক্ষেই দেখবো। তুমি তো জানো না মা, কেন ভগবান্ আমার মত লোকের মাথায় এই নারী-প্রতিষ্ঠানের চিন্তা দিলেন! সন্ধ্যা হয়ে এলো। তুমি একটু বসবে চলো মা।

বৃদ্ধ-শিক্ষক বলিলেন—আমার অন্যত্র একটু কাজ আছে এখন। আমি এখন যাই। আবার ঘণ্টা-দেড়েক পরে এসে নিয়ে যাবো।

আশুবাবু বলিলেন—তা যদি সুবিধা হয় আসবেন, না হয় আমি নিজেই মাকে পৌঁছে দেবো।

পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইলেন। আশুবাবু উঠিয়া সম্মুখস্থ পুষ্পপাত্র আনিলেন ও অতিযত্নে মমতার সহিত স্নেহবর্দ্ধিত ফুলগাছগুলি হইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া লতিকার সহিত একটি কক্ষে আসিলেন। কক্ষমধ্যে দেওয়ালে কয়েকখানি

তৈলচিত্র ছিল। সর্বোপরি জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি—মায়ের স্নেহ যেন মায়ের সদাপ্রফুল্ল মুখ হইতে শতধারে ঝরিয়া সমগ্র জগৎকে শান্ত, তৃপ্ত করিতেছে। জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির নীচে, দক্ষিণে প্রসন্নানন সৌম্যমূর্ত্তি—তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যঞ্জক দীপ্তোজ্জ্বল চক্ষু পুরুষ-মূর্ত্তি। নীচে লেখা—পিতৃদেব। বামে, অন্নপূর্ণার মত এক নারীমূর্ত্তি। বক্ষে, মুখে স্নেহ, দয়া দীপ্যমান! নীচে লেখা—মাতৃদেবী। এই দুইখানি ছবির নীচে ঠিক মাঝখানটিতে এক কিশোরীর ছবি। বড় কোমল ও সুকুমার মুখখানি। সৌন্দর্য্য যেন আকার ধরিয়া ছবিখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবির নীচে লেখা—মাধুরিমা।

প্রত্যেক ছবির নীচে ফুলের আধার ও ধূপ দিবার স্থান।

আশুবাবু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একে-একে সব ছবিগুলির নীচে ফুল দিয়া, দীপ ও ধূপ জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে-ধীরে কক্ষটি পুষ্প ও ধূপের গন্ধে সুরভিত হইয়া উঠিল।

*

*   *

আশুবাবু কিছুক্ষণ ছবিগুলির পানে নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন—ছবি দেখেই বুঝতে পারছো মা, কোন্‌খানি কার ছবি। কিন্তু এই নীচের ছবিখানি কার হয়তো বুঝতে পারছো না। এইখানির কথাই তোমায় বলবো ঃ

মাধুরিমা আমার মেয়ে। ঐ আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে নিজের হাতে শিক্ষা দিয়ে এসেছি। কিন্তু মায়ের আমার—অন্তরে ভগবান্ যে শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তাই যথেষ্ট ছিল। ছেলেবেলা থেকে কারো চোখে জল দেখলে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিতো। একটু বড় হতেই—কি ক'রে তাদের দুঃখ দূর করবে এই তার চেষ্টা হয়েছিল। তাকে স্কুল-কলেজে পড়াইনি, নিজে পড়িয়েছিলাম। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, গণিত, ইতিহাস—সব তাকে যতদূর আমার সাধ্য পড়িয়েছিলাম। শিক্ষার আলোক তার সারা মনে কোনো কুসংস্কার আনতে পারেনি। শিক্ষা ছিল, কিন্তু তার মনে তার জন্যে কোনোদিন বিন্দুমাত্র অহঙ্কার আসেনি।

অনেক খুঁজে ভগবানের দয়ায় তার উপযুক্ত পাত্রও পেয়েছিলাম···যেমন শিক্ষিত, তেমনি মধুচরিত্র। তাদের দু'জনেরি

এই জ্ঞান ছিল যে, কর্ত্তব্য শুধু ঘরের ভিতর সীমাবদ্ধ নয়, ঘরের বাহিরেও তার বহু স্থান। এমনি তার স্বভাব—এমনি তার মন যে, এখানে যেমন সে সকলের প্রাণ ছিল, শ্বশুরবাড়ীতেও ঠিক তেমনি হয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর বৌমা-অন্ত প্রাণ ছিল···দেওর-ননদ ঠিক যেন ভাই-বোনের মত অনুগত ছিল। স্বামী ছিল তার সঙ্গে একেবারে অভিন্ন-হৃদয়। এখান থেকে মাকে পাঠাবার সময় আমরা যেমন কাতর হতাম, শ্বশুরবাড়ী থেকে পাঠাবার সময়ে তার শ্বশুর-শাশুড়ীও তেমনি কাতর হতেন। মায়েরও এমন কোমল মন ছিল যে, চোখের জল না ফেলে সে এক-জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে পারতো না। সবাই তাকে ভালো-বাসতেন! তার ম্লানমুখ কারও প্রাণে সহ্য হতো না। কিন্তু তবু তাকে আমরা কেউ দুঃখের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি।

আশুবাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাধুরিমার তৈলচিত্রের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চিত্রের দিকে চাহিয়া লতিকা সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, এমন সৌভাগ্যবতী যে নারী, তার প্রাণে কিসের দুঃখ!

আশুবাবু আবার বলিতে লাগিলেন ঃ

মেয়েদের পড়াবার জন্যে তার মনে বড় আগ্রহ ছিল। গ্রামের মধ্যে গরীব-গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী যেতো···যারা তার সঙ্গে মেয়ে পাঠাতো তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতো।

তারপর সেই মেয়েদের কাছ থেকেই জানতে পারতো, কারা ভালো খেতে পায় না, কার পরবার কাপড় নেই, কারুর বাড়ীতে কোনো কষ্ট—কোনো দুঃখ আছে কি না। তার নিজের হাতে যে টাকাকড়ি থাকতো, তাই দিয়ে যথাসাধ্য তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতো। কোনো জায়গা থেকে কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে এসে বলতো—বাবা, ওদের বাড়ীতে কী কষ্ট! তার চোখে জল দেখে তাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তখনি তার ইচ্ছামত কাজ করতাম। শ্বশুরবাড়ী গিয়েও তার এই অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হয়নি। সেখানেও সবাই তার এই অভ্যাসকে স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। ঠিক এমনি ক'রে মায়ের শ্বশুরবাড়ীতেও একটা পাঠশালা গ'ড়ে উঠলো। মেয়েগুলি তাকে দিদি বলতে অজ্ঞান।

একদিন একটি ছোট মেয়ে তাকে বললে, তার বৌদিদির মায়ের বড় অসুখ, তিনি নাকি বাঁচবেন না। বৌদিদি দু'বছর বাপের বাড়ী যায়নি। বৌদিদির বাবা কতবার নিতে এসে ফি.র গেছেন। মা আর দিদি কিছুতে যেতে দেবেন না। বৌদিদি ব'লে দিয়েছে, আপনি যদি একবার বলেন তাহ'লে যেতে পারেন। বৌদিদি দিন-রাত্রি···

এই কথা শুনেই মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল।···মেয়েটি চলে গেল। মাধুরিমা সজল চোখে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে সব বললে। তিনি বললেন—তা, কান্না কেন মা? কি করতে চাও তুমি, বলো!

চোখ মুছে সে বললে—আপনি যদি আমায় নিয়ে ওদের বাড়ী যান মা, বৌটিকে একবার দেখে আসবো। দু'বছর বাপের বাড়ী যায়নি, তার উপর মায়ের এই অসুখ। তবু মা, তারা পাঠাচ্ছে না কেন তাই একবার জেনে আসবো।

শাশুড়ী চোখের জল মুছিয়ে তাকে শান্ত ক'রে বললেন—বেশ তো মা, তাই যাবোখ'ন। তুমি চোখ-মুখ ধুয়ে নাও। ঘণ্টাখানেক পরেই আমি তোমাকে নিয়ে বেরুবো।

সেখানে গিয়ে বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে শাশুড়ী ব'সে কথা কইতে লাগলেন। মেয়ে দুটি কাছে এসে বসলো। বৌটি ঘোমটা দিয়ে ভয়ে-ভয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। মাধুর শাশুড়ী বললেন—বৌমা আমার একটু বেড়াতে আর ছোট ছোট বৌঝিদের সঙ্গে কথা কইতে ভালোবাসেন, তাই নিয়ে এলাম।

কথায়-কথায় আরও বললেন—বৌমা, বাপের বড় আদরের দু'তিন মাস পরে একবার বাপের কাছে পাঠাতে হয়। তবে সেখানেও তিনি বেশীদিন রাখেন না।…তোমার বৌমাটি কত দিন এসেছেন দিদি?

দিদিটি তখন পঞ্চমুখী হয়ে বললে—যার যাবার কোনো চুলো নেই, সে আবার যাবে কোথায়? মুখে আগুন ওর বাপ-মায়ের।

মাধুরিমা আস্তে-আস্তে স'রে গিয়ে বৌটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে দু-চারটে কথা কয়ে নিলে। তারই মধ্যে জেনে নিলে যে, বিয়ের সময় বৌয়ের বাপ যে গহনা দিয়েছিল, তাতে

সোনা কম ছিল ব'লে শাশুড়ী গেয়ে রাখে যে, অন্তত দেড়শো টাকা ধ'রে না দিলে, বৌ পাঠাবে না।

উঠে আসার সময় কথায়-কথায় মাধুর শাশুড়ী বললেন—আপনার বৌটি তো অনেকদিন হলো বাপের বাড়ী যান্‌নি। একবার কেন পাঠিয়ে দিন্ না!

একটু বিরক্তভাবে বৌটির শাশুড়ী উত্তর দিলে—তেমনি ক'রে নিতে আসে তো পাঠাবো না কেন? আপনিও যেমন—সে মিন্‌সে আবার নিতে আসবে!

শাশুড়ীর সঙ্গে মাধু ফিরে এলো। পরদিন সেই মেয়েটির কাছে সে খবর পেলে, বাপের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে বৌটি গোপনে কিছু বলেছে এই সন্দেহ ক'রে, বৌটিকে কাল শাশুড়ী মেরেছে।

মাধু আর সহ্য করতে না পেরে, শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কেঁদে বললে—মা, বৌটিকে আপনি বাঁচান। শাশুড়ী বললেন—কি ক'রে বাঁচাবো মা. বলো। ওরা যদি বলে, পাঠাবো না, আমাদের কি জোর আছে মা? তখন সে বললে—আপনি যদি রাগ না করেন, আমায়—আপনি ও বাবা যে টাকা দিয়েছেন, তাই থেকে দেড়শো টাকা বৌটির বাপের কাছে পাঠিয়ে দিন, ঐ টাকা দিয়ে তিনি মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবেন।

শাশুড়ী এ-কথা শ্বশুরকে বললেন—ঠিকানা জেনে টাকা দিয়ে কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দাও। মা যেন কোনো কষ্ট না পান।

দেড়শো টাকা নিয়ে গিয়ে একজন কর্ম্মচারী বৌটির বাপের বাড়ীতে দিয়ে এলো আর সব ব'লে এলো। রুগ্ণা মায়ের বুকে আশা জাগলো। বাপ টাকা নিয়ে মেয়েকে নিতে এলো। বৌটি চলে যাবে এই ভেবে মাধুরিমা তাকে একটিবার দেখতে এলো। বৌটির মুখে প্রসন্ন হাসি, চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফুটে উঠলো।

কিন্তু, পরদিন এক ভীষণ খবর এলো। বৌটির বাপ দেড়শো টাকা দিয়ে আশা ক'রে বসে ছিল যে, বিকেলের দিকে সে মেয়েকে নিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু শেষমুহূর্ত্তে বৌটির শ্বশুর ব'লে বসলো, এতদিন টাকাটা প'ড়ে থাকার জন্যে সুদ হয়েছে পঞ্চাশ টাকা। সেই টাকা নিয়ে এলে তবে মেয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

বৌটির বাপ অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, কিন্তু কিছুই ফল হলো না। তারপর সে মেয়েকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল।

বৌটি মনের দুঃখে সেই রাত্রে আত্মহত্যা করলে।

খবরটি শোনামাত্র মাধুরিমা—'মাগো!' ব'লে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তারপরেই তার ভীষণ জ্বর। সে কি কঠিন অসুখ—আর, কি কাতর ও কঠিন প্রাণপণ চেষ্টা সকলের তাকে বাঁচাবার। বাড়ীসুদ্ধ সবাই সব-কাজ ফেলে তাকে নিয়ে রইলো। আমি স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে সেখানে রইলাম। ডাক্তার নিয়ে আসা হলো। কিন্তু সব বিফল। যে আঘাত তার মনে লেগেছিল তা আর সে সামলাতে পারলে না।

মা আমার সংসার থেকে বিদায় নেবার আগের দিন আমাকে ডেকে বললে—বাবা, তোমায় একটি কথা বলতে আমার ইচ্ছে করছে। আমি তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললাম—কি কথা, বলো মা! অনেক কস্টে—অনেকবার থেমে-থেমে সে আমায় এই শেষ কথা কয়টি ব'লে গেল :

বাবা, আমি লোকের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে বৌঝিদের সঙ্গে মিশে দেখেছি, তাদের মনের অবস্থা বড় নীচু। বেশীর ভাগ মেয়ের, একটা ভালো জিনিষ ভাববার সময়, সুযোগ, বা যোগ্যতা কিছুই নেই। দশ বছরের বৌকে বাড়ীতে নিয়ে এসে তার কাছ থেকে কুড়ি বছরের বুদ্ধি, শক্তি ও কাজ চায়। না পেলেই যন্ত্রণা দেবে। মনেও করে না যে, তার নিজের বাড়ীর দশ বছরের মেয়ে কতখানি পারে। আরও আশ্চর্য্য এই যে, বাড়ীর পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই যন্ত্রণা দেয় বেশী। ভালো শিক্ষা যদি এরা একটু পায় তো এদের জীবন অন্য-পথে যায়। বুঝে রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারলেও প্রাণে কত শান্তি পায়··· কাউকে দুঃখ দিতে হলেই প্রাণ কাঁদে···দুঃখ সহ্য করবারও শক্তি বাড়ে। যে বৌটি দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলে, সে লিখতে-পড়তে জানতো না। জানলে, মা-বাপকে, স্বামীকে চিঠি লিখে জানাতে পারতো···দুঃখের মাঝেও একটু সান্ত্বনা পেতো। তার শাশুড়ী-ননদ যারা তাকে এত কষ্ট দিতো, তারাও নিরক্ষর। ভালো চিন্তা—ভালো ভাব তাদের মনে কখনো আসতো না, তাই তারা এত নিষ্ঠুর হতে পেরেছিল।

এই বৌটি যদি আমার শাশুড়ীর মত শাশুড়ী পেতো, তাহ'লে কি তাকে এ-দুর্গতি ভোগ করতে হয়!

তাকে ওসব কথা আর ভাবতে নিষেধ করতে সে বললে—আমি আর ওসব কথা বলবো না। কিন্তু মরবার আগে তোমার কাছে এই প্রার্থনা ক'রে যাচ্ছি বাবা, যাতে আমাদের দেশের মেয়েরা সব লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায়, তুমি তার জন্যে অন্তরের সঙ্গে চেস্টা কোরো। তুমি যদি এইটি করো বাবা··· জীবনে আমি যেমন চিরদিন সুখে ছিলাম, মরণেও তেমনি সুখে থাকবো। তাছাড়া, কত সংসারের অশান্তি ঘুচে যাবে—কত মেয়ের দুঃখ তোমা হতে দূর হবে···

আমি বললাম—হ্যাঁ মা, তোমার কথামতই সব হবে। তুমি সেরে ওঠো, আমরা সবাই মিলে এই কাজ করবো।

তবু সে বললে—আমি যদি না বাঁচি বাবা, তবুও তোমরা করবে তো?

চোখে জল এলো। বললাম—হ্যাঁ মা, করবো।

মায়ের সজল চোখে হাসির আভা ফুটে উঠলো। আমাদের সবার চোখে জলের ধারা নেমে এলো। তার পরদিন মা আমার পৃথিবীর খেলা সাঙ্গ ক'রে চলে গেল! তার শ্বশুর-শাশুড়ী এখনও সে-শোক ভুলতে পারেননি। তার স্বামী সন্ন্যাসীর মত হয়ে আছে। তার মা এ-শোক সহ্য করতে না পেরে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার কাছে চলে গেছেন।

এখন বোধহয় বুঝতে পারছো মা, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া,

মেয়েদের এতটুকুও উন্নতির সহায় হওয়া আমার কতখানি প্রাণের কাজ ? আমার জামাই আর বেহাই তাঁদের দেশে দুটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলেছেন। আর, আমার এ-জীবনের এই ব্রত। এতেই আমার তৃপ্তি, আনন্দ—এতেই আমার শান্তি।

আশুবাবু চুপ করিলেন। তাঁহার কাহিনীর কারুণ্য, মাধুর্য্য ও পবিত্রতায় যেন গৃহখানি ভরিয়া রহিল। ধূপ জ্বলিয়া-জ্বলিয়া গন্ধ-বিকিরণ করিতে লাগিল, মাতার মুখের স্মৃতির মত পুষ্পের সৌরভ কক্ষমধ্যে জাগিয়া রহিল। লতিকার মনে হইল, মাধুরিমার স্নিগ্ধমুখর আঁখি দুটি হইতে যেন স্নেহ, প্রীতি ও কারুণ্য উছলিয়া পড়িতেছে।

*

*   *

লতিকার পত্রেই অমর লতিকার শিক্ষয়িত্রীর কাজের কথা অবগত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল।

লতিকা লিখিয়াছিল—আমি যে মাকে আর ভাই-বোনদের কিছু-কিছু সাহায্য করিতে পারিব, সেইটুকুই আমার পরম শান্তি। তবে, একেবারে একা থাকিতে এক-এক সময়ে বড় কষ্ট হয়। তখন ভাবি, চিরদিন যে একা থাকিতে হইবে ইহা তাহারই প্রারম্ভ মাত্র। বাবা চলিয়া গিয়াছেন, মাও হয়তো অতর্কিতে একদিন চলিয়া যাইবেন। তুমি দূরে—হয়তো-বা একদিন আরও দূরে চলিয়া যাইবে।

অমর খুব সংক্ষেপেই তার উত্তর লিখিল যে, ভবিষ্যতে সে কতখানি দূরে চলিয়া যাইবে তাহার উত্তর ভবিষ্যৎ-ই দিতে পারিবে। মানুষের সে-সম্বন্ধে অহঙ্কার করা বৃথা এবং জোর করিয়া কিছু বলাও কঠিন।

*   *   *   *

দিন কাটিতে লাগিল। কথিকা ও রামপ্রসাদ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। অমর এম. এ., বি. এল. পাশ করিয়া পিতার চেষ্টায় সহজেই ডাকঘরের Superintendent-এর পদ পাইল।

চন্দ্রনাথ সংবাদ পাইলেন যে, লতিকা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে এবং বিবাহ করিবে না এই সংকল্প প্রকাশ করিয়াছে।

অমরের বিবাহ চন্দ্রনাথবাবু একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, লতিকার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেলেই অমরের বিবাহ দিবেন। লতিকার সংকল্পের কথা শুনিয়া তিনি অমরের বিবাহের কথাবার্ত্তা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, অমর বড় হইয়াছে—একবার তাহার মত জানা প্রয়োজন।

পূজার ছুটিতে অমরের বাড়ী আসিবার কথা। চন্দ্রনাথ ভাবিলেন, এই সময়ে 'বাগীশ'কে আনাইয়া অমরের মত জানিতে পারিলে ভালো হয়। বাগীশ তখন কলিকাতায় ছিল না। অত্যন্ত ধনী ও বিখ্যাত জমিদার-বংশের ছেলে বলিয়া সে বি. এ. পাশ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছিল। বাগীশকে তিনি একখানি চিঠি লিখিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে সে যেন অন্তত একটি দিনের জন্যও একবার আসে।

বাগীশ আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমরের বিবাহের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না।

বাগীশ সব কথাই জানিত। সে বলিল—লতিকা বিবাহ করিতে অনুমতি দিলে সে সানন্দে সম্মত হইবে। তবু অমরকে আর একবার জিজ্ঞাসা করা ভালো।

চন্দ্রনাথ বলিলেন—আমি জিজ্ঞাসা করেছি, না-ব'লে, তুমি নিজে জিজ্ঞাসা করছো এইভাবে কথাটা বোলো।

বাগীশ সেইভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া চন্দ্রনাথকে জানাইল —অমর বলে যে, অন্যত্র বিবাহে সে সারাজীবন অসুখী হইবে।

অমরের পিতা-মাতার মধ্যে অনেক কথাই হইল। শেষে চন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, তিনি নিজে হইতে কৌলীন্য ভঙ্গ করিয়া বিবাহ দিতে মত প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু অমর যদি স্থির করে তো, লতিকাকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাতে সে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইবে না।

বাগীশ এই কথা অমরকে বলিলে, অমর বলিল যে, পিতার আন্তরিক ইচ্ছা না জানিলে এবং তাঁহার আশীর্বাদ না পাইলে সে লতিকাকেও বিবাহ করিতে চাহিবে না। তবে, লতিকা ব্যতীত আর কাহাকেও সে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবে না, ইহাও ঠিক।

ইহার পরে দুই বন্ধুতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

বাগীশ জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, লতিকা যদি ইহার মধ্যে আর-কাউকে বিয়ে করে?

অমর বলিল—লতিকা আর-কাউকে বিয়ে করবে না।

বাগীশ বলিল—তর্কের খাতিরেই ধরো, যদি করে?

অমর বলিল—তাহ'লে বাবা যেখানে বলবেন, সেখানেই বিয়ে করবো।

বাগীশ বলিল—তুমি কি সত্যিই মনে করো…একবার যাকে বিয়ে করতে চায়, তাকে ছাড়া অপরকে পুরুষ বা নারী কিছুতেই বিয়ে করে না!

অমর। একেবারে করে না সে-কথা বলছি না। তবে, করে না এমনও অনেক আছে।

বাগীশ। আচ্ছা, অদর্শনে ভালোবাসা বাড়ে, না, কমে?

অমর। সে—ভালোবাসা হিসাবে।

বাগীশ। তার মানে?

অমর। সত্যিকারের ভালোবাসা হ'লে বাড়ে, নইলে কমে।

বাগীশ। আচ্ছা ধরো, তুমি আর আমি দু'জনেই একজনকে ভালোবাসি। আমি প্রবাসে রয়ে গেলাম, তুমি গেলে সেখানে, যেখানে সে থাকে। ধীরে ধীরে তুমি যাওয়া-আসা করতে লাগলে। ক্রমশ তুমিই তার মন অধিকার করলে…আমি দূরে থেকে আরও দূরে চলে গেলাম।

অমর। এটা হলো তোমার ফাঁকির তর্ক। আসল কথাটাই তুমি বাদ দিয়ে গেলে। বললে, আমরা দু'জনেই একজনকে ভালোবাসি। সে-একজন যে কাকে ভালোবাসে, তা তো বললে না?

বাগীশ। ধরো, সে তোমাকেই একটু বেশী ভালোবাসে, কিন্তু আমাকেও একেবারে ঘৃণা করে না।

অমর। যদি আমাকে সে সত্যি ভালোবাসে, তাহ'লে তোমার সঙ্গলাভের চেয়ে, আমার স্মৃতিই বেশী ভালো লাগবে।

বাগীশ। ওটা হলো কাব্যের কথা। বস্তুতন্ত্রে ও-কথা বলে না।

অমর। বস্তুতন্ত্রে কি বলে?

বাগীশ। বলে, যখন যার কাছে থাকি, তখন তার মন রাখি; কিংবা out of sight, out of mind—চোখের বার হলেই মনের বার। আদর্শের দাম, আদর্শ-হিসেবে...বস্তুজগতে তার কোনো স্থান নেই।

অমর। এ-সব বিষয় নিজের মনে অনুভব করবার, অপরকে বোঝাবার নয়। তুমি যাকে বস্তুতন্ত্র বলো, সেইটে উদ্ধৃত করলেই কোনো জিনিষকে প্রমাণ করা হ'লো না এবং তা বিশ্বাস করাও চলে না।

বাগীশ। আচ্ছা, আমি যদি কাজের দ্বারা একে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি?

অমর। তাহ'লে বিশ্বাস করবো এবং মত বদলাবো।

ইহার পর দুইজনে এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। দুইদিন থাকিয়া বাগীশ চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে অমরের পিতাকে অমরের মনোভাব বলিয়া গেল।

লতিকাকে ছাড়া অমর আর কাহাকেও বিবাহ করিতে চায় না, ইহা বুঝিয়া চন্দ্রনাথবাবু দুঃখের সহিত বলিলেন—বংশ-

মর্য্যাদার মমতা আমার অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। আমি তাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারবো না। আমি অমরকে স্বাধীনতা দিচ্ছি। কিন্তু, প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিতে পারবো না।

বাগীশ অমরকেও এ-কথা বলিয়া গেল।

*

*　　*

আশুবাবুর বাহিরে যাইবার সময় আসিল। এবার তিনি লতিকার হাতে ঘর-বাড়ীর ভার দিয়া গেলেন। সেই সময়ে লোকেন্দ্রবাবু বলিয়া এক নূতন সাবডিভিসনাল-অফিসার আসিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। সমগ্র লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া, তাঁহার হাতেই তিনি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া গেলেন। লতিকাকে বলিয়া গেলেন যে, সে যদি তাহার মা ও ভাইবোন্‌দের এখানে আনে, তাহা হইলে যেন অসঙ্কোচে এই বাড়ীতে আসিয়া বাস করে। তাঁহার লোকজনদেরও তিনি এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া গেলেন। আশুবাবু লোকেন্দ্রবাবুর সহিত লতিকাকে পরিচিত করিয়া দিলেন।

ক্রমে লতিকার সহিত লোকেন্দ্রবাবুর বেশ পরিচয় হইল। মাঝে-মাঝে তিনি বিদ্যালয়ে আসিতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লতিকার সঙ্গে অনেক আলোচনা চলিতে লাগিল। লতিকা ইদানীং আশুবাবুর উপদেশ ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী পড়িয়া—স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা ও

অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিল। লোকেন্দ্রবাবুর সঙ্গে ইহা লইয়া সে অসঙ্কোচে আপনার মতামত প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিন ছিল। মেয়েদের আবৃত্তি বড়ই মধুর হইয়াছিল এবং সকলকেই নিরতিশয় তৃপ্ত করিয়াছিল। লোকেন্দ্রবাবু নিজ-ব্যয়ে মেয়েদের অনেকগুলি পুরস্কার দিয়াছিলেন। পুরস্কার বিতরণের অব্যবহিত পরে তিনি সভাস্থলে লতিকার অজস্র প্রশংসা করিয়া—বুদ্ধি, বিদ্যা, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা ও শিক্ষাপদ্ধতি—তদুপরি তাহার চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। সন্ধ্যার সময় মেয়েরা সব পুরস্কার ও মিষ্টান্ন লইয়া গৃহে ফিরিল। অভ্যাগতেরা এক-এক করিয়া বিদায় লইলেন। লোকেন্দ্রবাবু সব-শেষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। লতিকা বলিল—আপনি সেই কখন এসেছেন! একটু যাহয় কিছু খেয়ে যান্ না।

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—আপনিও তো ক্লান্ত। আপনারও এখন বিশ্রামের দরকার। আমি একেবারে বাসায় গিয়ে খাবো।

লতিকা বলিল—তাহ'লে এক পেয়ালা চা খেয়ে যান্। চায়ের সময় তো আপনার পেরিয়ে গেছে।

লোকেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—চায়ের সময় আমার পেরোবার ভয় নেই। কারণ, ও-উপসর্গ আমার নেই। তবে,

আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনার সঙ্গে আর-একটু গল্প ক'রে যেতে পারি।

লতিকাকে বলিতে হইল—বেশ তো, গল্প করুন না। তবে একটু মিষ্টিমুখ ক'রে, তারপর।

লোকেন্দ্রবাবু বলিলেন—আচ্ছা, তা'হলে ঘরে যা আছে তাই নিয়ে আসুন। কিছু তৈরি করতে পারবেন না কিন্তু।

ঘরে সামান্য কিছু ফল ছিল। লতিকা তাহাই কাটিয়া একটি রেকাবিতে সাজাইয়া তাহার সঙ্গে এক টুক্‌রা মিছরি দিয়া লোকেন্দ্রের সম্মুখে রাখিল। ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—এমনই অদৃষ্ট যে, ঘরে আজ আর কোনো মিষ্টিই নেই।

লোকেন্দ্র বলিলেন—ফলের মধ্যে মিষ্টি আছে···মিছরি তো মিষ্টিই···আর সবচেয়ে মিষ্টি আপনার কথা ও পরিবেশন। তবু আপনার ক্ষোভ!

কথা কয়টা এমন বিশেষ-কিছুই নয়। হয়তো ইহা মাত্র শিষ্টাচারের কথা, হয়তো-বা তাহাও নহে। তথাপি লতিকা একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সামান্য কথা হইতেই কত অসামান্য কথা উঠিয়া পড়ে! লতিকা নীরবে বসিয়া রহিল, উত্তরে কিছুই বলিল না।

লোকেন্দ্র ফলাহার করিয়া মিছরিটুকু মুখে দিলেন। তারপর জলপান করিয়া একটি পাণ লইলেন। পরে কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন—যদি অনুমতি দেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

লতিকা ভয়ে-ভয়ে বলিল—বলুন।

লোকেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আপনি কি কুমারী থাকবেন স্থির করেছেন ?

লতিকাকে লজ্জিত ও নিরুত্তর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লোকেন্দ্র বলিলেন—আপনি এতে কোনো দোষ নেবেন না। আমার এ-প্রশ্নের মধ্যে বিন্দুমাত্র অসম্মান নেই।

লতিকা ধীরে-ধীরে বলিল—আমি কুমারী থাকাই স্থির করেছি।

লোকেন্দ্র একটু আবেগের সহিত বলিলেন—আমাকে এক মিনিটের জন্যে একটা কথা বলার অনুমতি দিন দয়া ক'রে।

লতিকা নতমুখে বসিয়াছিল—মুখ তুলিয়া বলিল—বলুন!

লোকেন্দ্র বলিলেন—যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি আপনার প্রতি অনুরক্ত। আমি অবিবাহিত থাকারই সঙ্কল্প করেছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখে, আপনাকে জেনে, সে-সঙ্কল্প আমার ভেসে গিয়েছে! আপনার সব সন্ধানই আমি নিয়েছি। জেনেছি বিবাহে কোনো বাধা নেই। আপনাকে পাবার প্রত্যাশা করতে পারি কি ?

লতিকা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ধীরে-ধীরে বলিল—আমাকে ও-কথা বলবেন না।

লোকেন্দ্র বলিলেন—আমি আপনাকে দেখতে পেলে, আর মাঝে-মাঝে কথা কইতে পেলেই যথেষ্ট মনে করতাম, আপনার

কাছে আমার মনের এ-দুরাশা কখনো প্রকাশ করতাম না। কিন্তু, হয়তো পরে এর জন্যে আপনার কোনো নিন্দে হতে পারে, সেইজন্যে বিবাহের প্রস্তাব করছি। যদি আপনি অপরের অনুরাগিণী না হন এবং আমাকে ঘৃণা না করেন, তাহ'লে আমাকে গ্রহণ করুন!

লতিকা এতক্ষণ নতমুখে বসিয়াছিল। এবার তাহার অশ্রু-প্লাবিত মুখ তুলিয়া বলিল—আপনার মত সর্ব্বগুণান্বিত লোককে কে ঘৃণা করতে পারে? এমন স্বামী পাওয়া—যে-কোনো নারীরই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি অপরের বাক্‌দত্তা।

লোকেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিলেন—তবে আপনি যে বললেন, আপনাকে কুমারীই থাকতে হবে?

লতিকা বলিল—সে-কথাও সত্যি। তাঁকে লাভ করা আমার অদৃষ্টে নেই।

লোকেন্দ্র ক্ষুব্ধ-আবেগের সহিত বলিলেন—তাহ'লে কেন আমাকে বিমুখ করছেন? যে আপনাকে হতাদর করবে, তার অপেক্ষায় আপনি চিরজীবন ব'সে থাকবেন, আর যে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে চাইবে, তাকে আপনি নিরাশ করবেন?

লতিকা ধীরে-ধীরে বলিল—তিনি আমাকে এতটুকুও হতাদর করেননি। কিন্তু, তিনিও যে আমার মত নিরুপায়। আজও পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ করেননি, আর বোধহয় করবেনও না।

লোকেন্দ্র হঠাৎ পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—আর, যদি তিনি অন্য-কাউকে বিয়ে করেন, তাহ'লে আপনি অপরকে বিয়ে করতে রাজী হবেন তো ?

লতিকা এবার দৃঢ়-স্বরে বলিল—না। তাহ'লেও নয়।

লোকেন্দ্র তথাপি বলিলেন—কেন নয় ?

লতিকা বলিল—এর কারণ নির্দ্দেশ করতে আমি অক্ষম।

লোকেন্দ্র বলিলেন—কেন পারবেন না ? আপনারা দু'জনে দু'জনকে ভালোবাসেন এবং শীগ্‌গির হোক্, বা কিছুদিন পরেই হোক্, আপনাদের বিবাহ হবে, কাজেই আপনি অপরকে গ্রহণ করতে পারেন না···এই তো ? এর অর্থ বেশ বুঝতে পারি এবং এর বিরুদ্ধে আপনাকে কিছু বলবারও নেই। কিন্তু, তিনি আপনাকে ভালোবেসে, অপরকে বিবাহ করবেন, আর আপনি তাঁরই কথা ভেবে জীবন কাটাবেন, আর-কেউ আপনাকে প্রার্থনা করলে তার পানে ফিরেও চাইবেন না—এ শুধু আমাকে অপমান করা ছাড়া কিছুই নয়।

লোকেন্দ্রের এবারকার স্বর একটু কঠিন।

লতিকাও ইহাতে একটু অপমানিত জ্ঞান করিল। সে দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল—এ-প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নেই। এ-সব কথা ছেড়ে দিন।

লোকেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘর হইতে বাহির হইবার সময় মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই আপনার শেষ উত্তর তো ?

লতিকা উত্তরে বলিল—হ্যাঁ।

লোকেন্দ্র বলিলেন—এ-অপমানের যদি আমি প্রতিশোধ নিই—তবুও?

লতিকা উত্তর দিল—হ্যাঁ, তবুও।

লোকেন্দ্র আর-একবার লতিকার পানে চাহিয়া, বাহির হইয়া গেলেন।

*

*　　*

এক সপ্তাহ পরে লোকেন্দ্রবাবুর লোক আসিয়া লতিকার নামে একখানি খামের চিঠি দিয়া গেল। লতিকার মনে হইল, হয়তো-বা ইহার মধ্যে তাহার চাকরির জবাবই আছে। উদ্বিগ্ন-ভাবে খামখানি খুলিতে তাহার ভিতর দুইখানি পত্র পাইল। প্রথমখানি—লোকেন্দ্রবাবু বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ও সভাপতি হিসাবে তাহাকে পূর্ণ-বেতনে একমাসের ছুটি দিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়া দিয়াছেন, আজ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে যেদিন তাঁহার আত্মীয় আসিবেন, সেইদিন হইতে তিনি ছুটি লইতে পারিবেন। অপরখানি—পত্র হিসাবেই লেখা। তাহাতে লিখিয়াছেন ঃ

লতিকাদেবী,

সেদিনকার কথায় আমি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হই নাই। তাহাতে আপনার উপর আমার শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়াছে। সেদিন যাহা-কিছু অন্যায় বলিয়াছিলাম, তাহার জন্য যুক্তকরে মার্জ্জনা চাহিতেছি।

পত্র পড়িয়া লতিকা অপার বিস্ময়ে নিমগ্ন হইল। কেন তাহাকে ছুটি দেওয়া হইল, কে তাহাকে লইতে আসিবে—ইহার কিছুই সে স্থির করিতে পারিল না। পূর্ব্বে হইলে সে চিঠি

লিখিয়া—লোকেন্দ্রবাবুর কাছ হইতে ইহার কারণ জানিয়া লইত। একবার ভাবিল, ইহা কি তাহাকে এইভাবে সরাইয়া দিয়া, অন্য কাহাকেও এই কাজে নিযুক্ত করিবার উপায়? তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে এত ঘুরাইয়া এ-কাজ করিবার কি প্রয়োজন? সাদা-কথায় বলিয়া দিলেই হইত—তোমাকে আর প্রয়োজন নাই···

সারারাত্রি ভাবিয়া-ভাবিয়া লতিকা ইহার কোনো সঙ্গত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সকালে উঠিয়াও যখন সে ঐকথাই ভাবিতেছিল—তখন একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাহার বাসার সম্মুখে থামিল। গাড়ী করিয়া হঠাৎ এ-সময়ে কে আসিল তাহা দেখিবার জন্য তাহার উৎসুক-দৃষ্টির সম্মুখে যখন অমর গাড়ী হইতে নামিল, তখন তাহার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। লতিকার পায়ে-পায়ে যেন বাধিয়া যাইতেছিল, তথাপি দুরু-দুরু হৃদয়ে ছুটিতে-ছুটিতে সে বাহিরে আসিল। অমরের সঙ্গে যখন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহার হৃদয়ের দুরু-দুরু শব্দে সে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইতেছিল।

প্রথম কথা কহিল অমর,—ভালো আছো, লতু?

অমরের প্রসন্ন-সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া লতিকা শুধু একটিবার ঘাড় নাড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিতে গেল। সামান্য 'হ্যাঁ' কথাটাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অমর নীচু হইয়া লতিকাকে তুলিয়া ধরিল ও তাহার

অনুরাগভরা চোখের পানে চাহিয়া বলিল—বাবা এতদিন পরে প্রসন্নচিত্তে বিয়েতে মত দিয়েছেন। তাই আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

লতিকা আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। অমর তাহাকে বাহুপাশে ধরিয়া ফেলিল।

* * * *

অপরাহ্নে অমর ও লতিকা পাশাপাশি বসিয়া কথা কহিতেছিল। বাহির হইতে লোকেন্দ্রবাবু হাঁকিলেন—ভেতরে আসতে পারি? লতিকা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অমরকে দেখিয়া লোকেন্দ্রবাবু যেন অপ্রতিভভাবে বলিলেন—মাপ করবেন। আমি জানতাম না। আচ্ছা লতিকাদেবী, ইনিই কি তিনি, যিনি আপনারই মত নিরুপায়?

অমর জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

লোকেন্দ্র বলিলেন—খুব পারেন। আমি—ওস্‌মান। তবে আমি যুদ্ধ না করেই তিলোত্তমার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি।

অমর হাসিয়া ফেলিল। বলিল—বেশ, তাহ'লে বসুন।

লোকেন্দ্র হাসিমুখে বসিলেন।

অমর লতিকার পানে চাহিয়া বলিল—তুমি একে চিনতে পারোনি?

লতিকা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, অসহায়ের মত চাহিয়া রহিল।

অমর বুঝাইয়া বলিল—তুমি বাগীশের নাম শুনেছো তো? এ সেই বাগীশ। 'লোকেন্দ্র' এর একেবারেই ছদ্মনাম; এতদিন বাক্সে তোলা ছিল। এর চিঠি পেয়েই তো আমি আসছি।

লোকেন্দ্র বলিল—উনি তো আগের কথা জানেন না; এইটুকু বললে উনি কি ক'রে বুঝবেন?

অমর তখন বলিল—বাগীশকে দিয়ে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, বিয়েতে আমার মত আছে কি না। বাগীশকে আমি বলেছিলাম, যদি বাবার মত হয় তো, তোমাকে পেলে আমি কৃতার্থ হই। আর, যদি তাতে বাবার মত না হয়, তাহ'লে বিবাহ করবো না। তাতে বাবা বলেন—আমার যদি ইচ্ছা হয়, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি। তবে, তিনি নিজে থেকে এ-বিবাহে সম্মতি দিতে পারবেন না। আমি তখন বলি যে, বাবার সম্পূর্ণ সম্মতি না পেলে আমি বরং চিরকাল অবিবাহিতই থাকবো। এইসব নিয়ে বাগীশের সঙ্গে তর্ক হয়। ও বলে—অদর্শনে ভালোবাসা কমে এবং প্রিয়জনের বহুকাল অদর্শনের মধ্যে যদি আর-কেউ আসে, তাহ'লে তার প্রিয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে বেশী দেরী হয় না। আমি বলি —সত্যিকার অনুরাগ থাকলে অদর্শনে তা বাড়ে বই কমে না। বাগীশ জিজ্ঞাসা করে—যদি তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করো তাহ'লে আমি অন্যত্র বিবাহে রাজী আছি কি না।

আমি বলি—লতিকা কিছুতেই অপর-কাউকে বিয়ে করবে না। যদি করে, তাহ'লে অন্য বিয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

লোকেন্দ্র বলিল—এবার তাহ'লে 'অমরনাথের কথা' হোক্।

তারপর লতিকার পানে চাহিয়া বলিল—এইজন্য লোকেন্দ্র আপনার কাছে কোনোদিন 'বাগীশ' হয়নি এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে আপনার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল। তবে, আপনারই সম্পূর্ণ জয় হয়েছে। আমি আপনাকে প্রণাম করি। অমরেরই জয়জয়কার। অমরের বাপেরও একটু আশা ছিল, হয়তো আপনি অন্য-কাউকে বিয়ে করতে পারেন। যখন আপনার কাছে আমি শেষ উত্তর পেলাম, তখন অমরের বাপকে সব কথা লিখে পত্র দিলাম। অনেক ক'রে তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আপনাদের দু'জনের বিবাহে বাধা না দেন এবং সম্পূর্ণ অনুমতি দেন। এর পরেই তিনি মত পরিবর্ত্তন ক'রে অমরকে ডাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিয়েছেন।

অমর বলিল—বাবা তখন আমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন—আজই গিয়ে মাষ্টারমহাশয়ের স্ত্রীকে এ-খবর দিয়ে, লতুকে এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দাও। তারপর আমি সেইদিনই গিয়ে তাঁকে সব কথা বলি।

স্যারের নতুন বড় ছবিখানিও তাঁকে দিয়ে এসেছি। সেই-দিনই ইতিহাসের প্রকাশকদের কাছ হতে পত্র আসে যে,

এ-বৎসরে সেই বই থেকে তাঁর অংশে এক হাজার টাকা প্রাপ্য হয়েছে। কিভাবে এবং কোথায় টাকা পাঠাতে হবে, জানালেই তাঁরা টাকা পাঠাবেন।

সেই পত্র পড়ে আর স্যারের সেই ছবি দেখে খুড়িমার সে কি কান্না! সে-কান্না চিরদিন আমার মনে থাকবে! তাঁকে কত ক'রে শান্ত ক'রে তবে এসেছি।

এ-কথায় তিন জনেরই চোখে জল আসিল।

অপরাহ্নে লতিকাকে লইয়া অমর সেখান হইতে বাহির হইল। লোকেন্দ্র আসিয়া তাহাদের ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে লতিকা ও অমর দুর্গাপুরে আসিয়া পৌঁছিল।

দু'জনে একসঙ্গে মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া যখন প্রাচীর-বিলম্বিত মনোহরের তৈলচিত্রের সম্মুখে নত হইয়া প্রণাম করিল, তখন মনে হইল, চিত্রে মনোহরের প্রশান্ত মুখমণ্ডল যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং তাহার নির্ম্মল নয়ন দু'টি হইতে আশীর্ব্বাদের অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মরণে মনোহরের প্রেম অমর হইয়া উঠিল।

জীবনের সকল বিফলতা বুঝি—মরণেই এমনি সফল হইয়া উঠে।

সমাপ্ত